না হইলে উভয়ের উপর অর্ধেক অর্ধেক ছাগী যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। উভয়ের ছাগল মিলিয়া একত্রে একশত বিশটি হইলে দুইজনে মিলিয়া একটি ছাগী যাকাত দিলেও চলিবে।

(২) শস্যের যাকাত ঃ কাহারও অধিকারে গম, যব, খুরমা, মোনাক্কা বা এমন কোন খাদ্যশস্য যদ্দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে, যেমন মুগ, ছোলা, চাউল, প্রভৃতি থাকিলে উক্ত শস্যের এক-দশমাংশ যাকাত দেওয়া ওয়াযিব। খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন, তুলা, সূতা ইত্যাদি এবং ফল-ফলাদির যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নহে।

গম এবং যব থাকিলেও এক-দশমাংশ দেওয়া ওয়াজিব নহে। কারণ যাকাত ওয়াযিব হওয়ার জন্য একজাতীয় বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে অধিকারে থাকা আবশ্যক। নদী-নালা, খাল ও প্রণালী হইতে পানি সিঞ্চন করত শস্য উৎপাদন করিলে যাকাত দিতে হয় না। শস্যের যাকাতে তাজা আঙ্গুর ও খুরমা দেওয়া উচিত নহে; বরং মোনাক্কা (শুষ্ক আঙ্গুর) ও শুষ্ক খোরমা দেওয়া উচিত। কিন্তু যে আঙ্গুর শুষ্ক হইয়া মোনাক্কা হয় না তদ্দ্বারাও যাকাত দেওয়া যাইতে পারে। বৃক্ষে আঙ্গুরে রং ধরিলে এবং যব ও গমের গোটা শক্ত হইয়া উঠিলে যাকাতের আনুমানিক হিসাব না করিয়া উহা হইতে কিছু খরচ করিবে না। আনুমানিক হিসাব করিয়া লইলে উহা হইতে খরচ করা জায়েয আছে।

(৩) স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত ঃ রৌপ্য দুইশত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা পূর্ণ এক বৎসর অধিকারে থাকিলে তন্মধ্য হইতে বৎসর শেষে পাঁচ দিরহাম যাকাত দেওয়া ওয়াজিব এবং খাঁটি স্বর্ণ বিশ দিনার। (৭॥ তোলা) এক বৎসর অধিকারে থাকিলে ইহা হইতে অর্ধ দিনার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। স্বর্ণ-রৌপ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়। স্বর্ণ-রৌপ্য যত অধিক হউক না কেন, এই হিসাবে যাকাত দিতে হইবে। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত তৈজষপত্র, স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত ঘোড়ার সাজ ও তরবারি ইত্যাদি এবং স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত যে সকল বস্তু ব্যবহার নিষিদ্ধ উহা থাকিলে এই সমস্তের যাকাত দিতে হইবে। কিন্তু যে সকল অলংকার স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার জায়েয উহার যাকাত দিতে হইবে না। (হানাফী মতে অলংকারের যাকাত দিতে হইবে)। যে স্বর্ণ-রৌপ্য অপরের নিকট গচ্ছিত আছে এবং চাওয়ামাত্র পাওয়া যাইতে পারে উহারও যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

(৪) পণ্য-দ্রব্যের যাকাত ঃ অন্ততঃপক্ষে বিশ দিনার মূল্যের কোন এক প্রকার পণ্যদ্রব্য খরিদ করত বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখিলে খরিদের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইলে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। এক বৎসরে যে লাভ হয় তাহাও হিসাবে ধরিয়া যাকাত দিতে হইবে। প্রতি বৎসরের শেষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিতে

হইবে। মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য-দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকিলে সেই মুদ্রা দ্বারাই যাকাত দিবে। মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করা না হইয়া থাকিলে দেশের প্রচলিত মুদ্রায় মূল্য নির্ণয় করত তদনুসারে যাকাত দিবে। এক ব্যক্তি হস্তস্থিত সামান্য ধনের বিনিময়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কিছু মাল খরিদ করিল। কেবল ব্যবসায়ের নিয়ত ছিল বলিয়াই সেই সময় হইতেই ইহার যাকাত ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু উহা নগদ ও যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী হইলে মালিক হওয়ার সময় হইতেই যাকাতের হিসাব ধরিতে হইবে। আর প্রথম খরিদের সময় যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য থাকে এবং এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সেই উদ্দেশ্য লোপ পায় তবে যাকাত লাগিবে না।

(৫) ফিতরা ঃ ইহাও একরকম যাকাত। রমযানের ঈদের রাত্রে যে মুসলমান এই পরিমাণ খাদ্যশস্যের অধিকারী থাকে যাহাতে ঈদের দিনের আহারাদি স্বাচ্ছন্দ্যে চলিয়া কিছু উদ্বৃত্তও থাকে এবং ইহা ছাড়া গৃহে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রও বাহির হইতে পারে, তবে এমন ব্যক্তির উপর খাদ্যশস্য হইতে এক সা' (صاع) পরিমিত শস্য ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব। (এক সা' আশি তোলা সেরের তিন সের আট ছটাক চারি তোলা হয়।) যে ব্যক্তি গম আহার করে, যব দ্বারা ফিতরা দেওয়া তাহার উচিত নহে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি যব আহার করে তাহার গম দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শস্য আহার করিলে উহার মধ্যে যাহা উত্তম তদ্দ্বারা ফিতরা দিতে হইবে। গমের পরিবর্তে আটা ইত্যাদি দেওয়া উচিত নহে। ইহা হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মত। এক পরিবারভুক্ত যত লোকের ভরণ-পোষণ গৃহস্বামীর উপর তত লোকের ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব ; যেমন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, দাস-দাসী। দাস বা দাসীর উপর দুই ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে তাহার ফিত্‌রা দেওয়া উভয়ের উপর ওযাজিব। কাফির দাস-দাসীর ফিত্‌রা দেওয়া ওয়াজিব নহে। নিজের ফিত্‌রা নিজের দেওয়া স্ত্রীর জন্য দুরস্ত আছে। আবার স্বামী স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে তাহার ফিতরা দিলেও দুরস্ত হইবে।

যাকাত সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি উপরে বর্ণিত হইল। ইহার অতিরিক্ত জানিবার প্রয়োজন হইলে অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট জানিয়া লইবে। যাকাত দিবার নিয়ম ঃ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাকাত দিতে হয়। (১) যাকাত দিবার সময় নিয়ত করিতে হইবে, "আমি ফরয যাকাত দিতেছি।" অথবা যাকাত প্রদানের জন্য কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে নিযুক্ত করিবার সময় এইরূপ নিয়ত করিবে, "ফরয যাকাত বণ্টনের জন্য আমি প্রনিধি নিযুক্ত করিতেছি।" অথবা প্রতিনিধিকে বলিয়া দিতে হইবে, "যাকাত দিবার সময় নিয়ত করিবে যে, তুমি আমার

পক্ষ হইতে ফরয যাকাত প্রদান করিতেছ।" (২) বৎসর পূর্ণ হইলে শীঘ্র যাকাত দেওয়ার চেষ্টাই রবে। বিনা কারণে বিলম্ব করা উচিত নহে। ঈদের দিনের মধ্যে ফিতরা দিয়া দিবে। রমযান শরীফের মধ্যে ফিতরা দেওয়া দুরস্ত আছে ; কিন্তু রমযানের পূর্বে দেওয়া দুরস্ত নহে। মালের যাকাত বৎসরের প্রথম হইতে দিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে যাকাত দেওয়া হইয়াছে সে বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মরিয়া গেলে অথবা ধনবান বা কাফির হইয়া গেলে প্রদত্ত যাকাত আবার দিতে হইবে। (৩) যে বস্তুর যাকাত সেই বস্তু দ্বারাই যাকাত দিতে হইবে। রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং যবের পরিবর্তে গম অথবা যাকাতের মূল্যের পরিমাণ অন্য কোন বস্তু প্রদান করা হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মতে সঙ্গত নহে। (৪) ধন যে স্থানে থাকে সে স্থানেই যাকাত দিবে। কারণ, সে স্থনে গরীব-মিসকিনগণ যাকাতের আশায় থাকে। অন্য কোন স্থানে বণ্টনের জন্য পাঠাইলেও যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। (৫) যে পরিমাণ যাকাতই হউক না কেন. আট দল লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত এবং কোন দলেই তিনজনের কম হইবে না এবং সর্বমোট চব্বিশজন হইবে। যাকাতের এক দিরহাম হইলেও হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-র মতে চব্বিশ ব্যক্তিকে দিতে হইবে। ইহার আট ভাগ করত প্রত্যেক ভাগ তিনজকে অথবা বণ্টনকারী ইচ্ছানুযায়ী তিনের অধিক সংখ্যক লোককে দিয়া দিবে। যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অংশ পরস্পর সমান না হইলেও চলিবে। যে আট দলের মধ্যে যাকাত বণ্টন করিতে হইবে তাহারা হইল–(১) ধর্ম-যোদ্ধা, (২) মুআল্লাফায়ে কুলূব অর্থাৎ সম্মানী নওমুস্‌লিম। (৩) যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত তহশীলদার, (৪) ফকির, (৫) মিসকিন, (৬) ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তি দানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস। (৭) মুসাফির ও (৮) ঋণী ব্যক্তি। প্রথম তিন শ্রেণীর লোক আজকাল পাওয়া দুষ্কর। অবশিষ্ট পাঁচ শ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে। পনের জনের কম লোকের মধ্যে যাকাত দেওয়া কাহারও উচিত নহে। শাফেঈ মযহাবে এইরূপ নির্দেশ আছে। উল্লিখিত সংখ্যক ও শ্রেণীর লোককে যাকাত দেওয়া এবং যে বস্তুর যাকাত সে বস্তু দ্বারাই যাকাত প্রদান করা ও উহার বিনিময়ে অন্য বস্তু না দেওয়ার যে আদেশ শাফেঈ মযহাবে রহিয়াছে তাহা পালন করা বড় কঠিন। এইজন্যই শাফেঈ মাযহাবের অধিকাংশ লোক যাকাত– প্রদান ব্যাপারে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র অনুসরণ করিয়া থাকে। আমরা আশা করি, এইজন্যই তাহাদিগকে ধরপাকড় করা হইবে না।

যাকাত গ্রহণযোগ্য আট প্রকার লোকের পরিচয় ঃ (১) ফকির যাহার কিছুই নাই এবং উপার্জনেও অক্ষম, এমন ব্যক্তিকেই ফকির বলে। যাহার একদিনের খাদ্য ও সতর ঢাকিবার উপযোগী বস্ত্র আছে সে ফকির নহে। কিন্তু যাহার অর্ধদিনের আহার ও সম্পূর্ণ পোশাক আছে অর্থাৎ চাদর আছে পাগড়ী নাই অথবা পাগড়ী আছে চাদর নাই,

তবে এমন ব্যক্তি ফকির বলিয়া গণ্য হইবে। হাতিয়ার থাকিলে লোকে কাজকর্ম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে। হাতিয়ারের অভাবে কাজকর্ম করিতে অক্ষম ব্যক্তিকেও ফকির বলা যায়। অভাবগ্রস্ত ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থী ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে যদি ইল্‌মে দীন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় তবে তাহাকেও ফকির শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। অল্পবয়স্ক শিশু ব্যতীত প্রকৃত ফকির খুব কম পাওয়া যায়। অতএব পোষ্য-বর্গবিশিষ্ট ফকির তালাশ করিয়া লইবে এবং শিশু-সন্তানদের জন্য এরূপ ফকিরকে তাহার অংশ দান করিবে। (২) মিসকিন। যাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় তাহার আয় অপেক্ষা অধিক, তাহার বাসগৃহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ থাকিলেও সে মিসকিন। এমন ব্যক্তির যদি এক বৎসরের জীবিকা না থাকে এবং তাহার নিজস্ব উপার্জনে এক বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তবে তাহাকে এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া জায়েয যাহাতে তাহার বৎসরের অবশিষ্টাংশের খরচ চলে। বিছানা, গৃহের তৈজষপত্র ও কিতাবাদি থাকিলেও তাহার এক বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলানের অভাব থাকিলে সে মিসকিন। কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত কোন জিনিস তাহার থাকিলে সে মিসকিন নহে। (৩) যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত তহশীলদার। তহশীলদারগণ ধনী লোকদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করত যাকাত পাওয়ার যোগ্য লোকদের মধ্যে বণ্টনের উপায় করিয়া থাকে। তাহাদের বেতন আদায়কৃত যাকাতের মাল হইতে দেওয়া উচিত। (৪) মুআল্লাফায়ে কুলূব অর্থাৎ সম্মানী নওমুসলিম। এইরূপ লোকদিগকে ধন দান করিলে ধন লাভের আশায় অন্যান্য লোকও মুসলমান হওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারে। (৫) ক্রয়-মূল্য প্রদানে মুক্তিদানে প্রতিশ্রুত ক্রীতদাস। যে–সকল দাস-দাসী ক্রয় মূল্য দুই বা ততোধিক কিস্তিতে প্রদানের অঙ্গীকারে স্বীয় প্রভু হইতে মুক্তি লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে দরিদ্র হউক, কি ধনী হউক কোন সৎ উদ্দেশ্যে বা বিপদ মোচনের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে গিয়া ঋণের দায়ে পড়িয়া থাকিলে তাহা পরিশোধের জন্য সে যাকাতের মাল গ্রহণ করিতে পারে। (৭) ধর্মযোদ্ধা। যে ধর্মযোদ্ধার জীবিকা বাইতুল মাল হইতে নির্ধারিত নহে, সে ধনী হইলেও তাহার সফরের সামানের খরচ যাকাতের মাল হইতে দেওয়া উচিত। (৮) সফররত পাথেয়শূন্য মুসাফির বা বাড়ি হইতে বিদেশ যাওয়া কালে পথ-খরচের অভাব হইলে যাকাতের মাল হইতে তাহাকে পথ-খরচের পরিমাণ দেওয়া উচিত।

কোন ব্যক্তি নিজকে ফকির বা মিসকিন বলিয়া পরিচয় দিলে সে মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া যদি জানা না যায় তবে তাহার কথা বিশ্বাস করত তাহাকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে। কোন ধর্মযোদ্ধা বা মুসাফির ধর্মযুদ্ধ বা সফরের উদ্দেশ্যে যাকাত গ্রহণ

করত যুদ্ধ বা বিদেশ-ভ্রমণে না গেলে তাহার নিকট হইতে যাকাতের মাল ফেরত লওয়া আবশ্যক। যাকাতের মাল গ্রহণযোগ্য অবশিষ্ট চারি প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট হইতে জানিয়া নিঃসন্দেহ হইলে পর তাহাদিগকে যাকাত দিবে।

যাকাতের তাৎপর্য ঃ নামাযের যেমন একটি বাহ্যরূপ এবং একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে যাহা নামাযের প্রাণ তদ্রূপ যাকাতেরও একটি বাহ্যরূপ এবং একটি গূঢ় তাৎপর্য বা প্রাণ আছে। যে ব্যক্তি যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য বা প্রাণ আছে। যে ব্যক্তি যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য অবগত নহে তাহার যাকাত প্রাণশূন্য দেহের ন্যায়। যাকাতের গূঢ় তাৎপর্য তিনটি।

প্রথম তাৎপর্য ঃ আল্লাহ্‌কে ভালবাসিবার নির্দেশ বান্দাকে দেওয়া হইয়াছে এবং এমন কোন মুসলমান নাই, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার দাবি করে না। এমনকি, আল্লাহ অপেক্ষা অপর কোন কিছুকেই অধিক ভাল না বাসার নির্দেশও মুসলমানকে দেওয়া হইয়াছে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَائُكُمْ وَاَبْنَائُكُمْ الاية -

অর্থাৎ "তোমাদের পূর্বপুরুষ, সন্তানগণ, ভ্রাতৃবর্গ, সহধর্মিণিগণ, আত্মীয়স্বজন উপার্জিত ধন, তৃপ্তিজনক বাণিজ্য ও আরামদায়ক গৃহ তোমাদের নিকট আল্লাহ্, রসূল ও জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইলে আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা কর। আল্লাহ্ অনাচারীকে ভালবাসেন না।" মোটকথা এমন কোন মুসলমান নাই, যে যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক ভালবাসার দাবি করে না এবং এই দাবিতে সকলেই নিজকে সত্য বলিয়া মনে করে। এমতাবস্থায় এই দাবির সত্যতার নিদর্শনও প্রমাণের আবশ্যক। তাহা হইলে কেহই ভিত্তিহীন দাবি করিয়া গর্বিত হইয়া পড়িবেন না। ধন মানুষের প্রিয় বস্তুর অন্যতম। তাই মানুষ ধন অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসে কিনা উহা যাচাই করিবার জ্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "যদি মোমরা আমাকে সর্বাধিক ভালবাসিয়া থাক তবে তোমাদের প্রিয় বস্তু ধন আমার জন্য উৎসর্গ কর। আমার ভালবাসার ব্যাপারে তোমরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা এই উপসর্গ কার্য দ্বারাই বুঝিতে পারিবে।" যাবতীয় পদার্থ অপেক্ষা যাঁহারা আল্লাহ্‌কে অধিক ভালবাসেন তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী ঃ সিদ্দিকগণ ঃ তাঁহারা নিজেদের যথাসর্বস্ব আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, "দুইশত দিরহামের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রদান করা কৃপণের কাজ। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া যথাসর্বস্ব তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য।" যেমন হযরত আবূ বকর রাদিয়াআল্লাহু আনহু নিজের যথাসর্বস্ব

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সিদ্দিক! নিজের পরিবারবর্গ ও সন্তানাদির জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ?" হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, "একমাত্র আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে রাখিয়া আসিয়াছি।' কেহ কেহ নিজের অর্ধেক মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রদান করিয়াছেন, যেমন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত করিলেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ফারুক, সন্তানাদির জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ?" হযরত উমার (রা) নিবেদন করিলেন, "এখানে যে পরিমাণ আনিয়াছি সে পরিমাণ রাখিয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) বলিলেন ঃ

بَيْنَكُمَا مَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتٌ -

অর্থাৎ "তোমাদের (মরতবার) পার্থক্য উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে।" **দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ** পুণ্যবানগণ। তাঁহারা সামর্থ্যের অভাবে নিজেদের যথাসর্বস্ব আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া দেন না বটে কিন্তু তৎসমুদয় ফকির-মিসকিনদের অভাব মোচন ও সৎকাজে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত রাখিয়া উহার প্রতীক্ষায় থাকেন। তাঁহারা দরিদ্রের ন্যায় জীবিকা নির্বাহ করেন এবং শুধু যাকাত দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন না, যে সমস্ত অভাবগ্রস্ত লোক তাঁহাদের নিকট আসে তাহাদিগকে তাঁহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির ন্যায় মনে করেন এবং তদনুযায়ী সাহায্য করিয়া থাকেন। **তৃতীয় শ্রেণী ঃ** সাধারণ মুসলমান। তাহারা দুইশত দিরহামের মধ্যে পাঁচ দিরহামের অতিরিক্ত দানের ক্ষমতা রাখে না এবং কেবল ফরয যাকাত আদায় করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু তাহারা যাকাত প্রদানে আল্লাহ্‌র আদেশ খুশি মনে অতি সত্ত্বর পালন করিয়া থাকে এবং যাকাত প্রদান করিয়া ফকির মিসকিনদের উপর ইহসান করা হইল বলিয়া বেড়ায় না। আল্লাহ্‌র-প্রেমিকদের মধ্যে তাহারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে দুইশত দিরহামের অধিকারী হইয়া পাঁচ দিরহামও তাঁহার পথে দান করিতে অনিচ্ছুক, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা হইতে একেবারে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি পাঁচ দিরহামের অধিক দিতে পারে না, আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার ভালবাসা নিতান্ত দুর্বল। সে আল্লাহ্ প্রেমিকদের মধ্যে নিতান্ত কৃপণ ও নগণ্য।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ কৃপণতার মলিনতা হইতে অন্তর পাক করা। কারণ, কৃপণতা অন্তরের মলিনতাস্বরূপ। বাহ্য অপবিত্রতা দেহকে যেমন নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার উপযুক্ততা রাখে না তদ্রূপ কৃপণতারূপ অপবিত্রতাও অন্তরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অযোগ্য করিয়া রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে ধন ব্যয় না করিলে অন্তরকে কৃপণতারূপ অপবিত্রতা হইতে পাক করা যায় না। যাকাত অন্তরের এই অপবিত্রতা দূর করে। যাকাত এমন পানিস্বরূপ যদ্দ্বারা অপবিত্রতা ধৌত করা হয়। এই কারণেই যাকাত ও

সাদকার মাল রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার বংশধরগণের জন্য হারাম করা হইয়াছে যেন তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদা ঐ মালের অপবিত্রতা হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারে।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ সম্পদের কৃতজ্ঞতা। ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তির কারণ হইয়া থাকে। নামায, রোযা, হজ্জ যেমন দেহরূপ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা তদ্রূপ যাকাত ধনরূপ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা। মানুষ নিজকে ধনৈশ্বর্যের প্রভাবে নিশ্চিন্ত অবস্থায় দেখিয়া যখন তৃপ্তিবোধ করে তখন তাহারই ন্যায় অপর মুসলমানকে অর্থাভাবে কষ্টে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে তাহার বলা উচিত, 'এই ব্যক্তিও তো আমার ন্যায় আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। আল্লাহ্ আমাকে তাহার মুখাপেক্ষী করেন নাই, বরং তাহাকে অভাবগ্রস্ত করিয়া আমার মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন, এই জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। অতএব এই অভাবগ্রস্তের প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা আমার উচিত। আমাকে যে পরমুখাপেক্ষী করেন নাই ইহা আমার জন্য পরীক্ষাও হইতে পারে। বিচিত্র নহে যে, গরীব-দুঃখীদের প্রতি অনুগ্রহ ও সৌজন্য প্রদর্শনে ত্রুটি করিলে আল্লাহ্ আমার অবস্থা তাহাদের ন্যায় এবং তাহাদের অবস্থা আমার ন্যায় করিয়া দিবেন।"

যাকাত প্রদানের উল্লিখিত গুঢ় তাৎপর্য সকলেরই অবগত হওয়া আবশ্যক যাহাতে যাকাতরূপ ইবাদত প্রাণহীন দেহের মত হইয়া না পড়ে।

ঃযাকাতের নিয়মাবলী ঃ নিজের যাকাতরূপ ইবাদতকে প্রাণশূন্য না করিয়া সজীব পাইতে চাহিলে এবং ইহাতে দ্বিগুণ সওয়াব পাইবার আশা করিলে সাতটি নিয়ম পালন করা প্রত্যেক যাকাত প্রদানকারীর কর্তব্য।

(১) যাকাত প্রদানে তাড়াতাড়ি করা। যাকাত ওয়াযিব হইবার পূর্বে সমস্ত বৎসরের মধ্যে কোন সময় আদায় করিয়া দিবে। ইহাতে তিনটি উপকারিতা আছে। (ক) ইবাদতের আনন্দের প্রভাব তাহার উপর প্রকাশ পাইবে। যাকাত ওয়াযিব হইবার পর আদায় করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আদায় না করিলে আযাব হইবে, এই ভয়েই আদায় করা হইতেছে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের কারণে আদায় করা হইতেছে না। যে ব্যক্তি ভয়ে কাজ করে, ভালবাসা ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাজ করে না, সে বান্দা ভাল নহে। (খ) তাড়াতাড়ি যাকাত দান করিলে ফকির-মিসকিনদের মন সন্তুষ্ট হইবে। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাহারা প্রফুল্লচিত্তে আন্তরিকতার সহিত দাতার জন্য দু'আ করিতে থাকিবে এবং তাহাদের দু'আ দুর্ভেদ্য প্রাচীরস্বরূপ হইয়া দাতাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। (গ) তাড়াতাড়ি যাকাত দিলে বিলম্বজনিত আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, বিলম্বে অনেক আপদই ঘটিয়া থাকে। হয়ত এমন

কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে যাহাতে শুভ কাজ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। মানব-হৃদয়ে নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মিলে ইহাকে আশীর্বাদস্বরূপ গ্রহণ করা উচিত। কারণ, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দৃষ্টি আছে বলিয়াই হৃদয়ে নেক কাজের আগ্রহ জন্মিয়াছে, পর মুহূর্তেই হয়ত শয়তানের প্রবঞ্চনারূপ আক্রমণে সে আগ্রহ বিনষ্ট হইতে পারে। বর্ণিত আছে যে, অবশ্যই মু'মিনের হৃদয় আল্লাহ্‌র দুই অঙ্গুলির মধ্যে রহিয়াছে।

কাহিনী ঃ এক বুযুর্গ পায়খানায় বসিলেন, এমন সময় ফকিরকে একটি পিরহান দান করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজদেহে পরিহিত পিরহানটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার এক মুরীদকে ডাকিয়া পিরহানটি তাহার দিকে নিক্ষেপ করত বলিলেন, "ইহা অমুক গরীবকে দিয়া দাও।" নির্দেশ পালনের পর মুরীদ নিবেদন করিলেন–"হে মহাত্মন, পায়খানা হইতে বাহির হইয়াই তো পিরহানটি দিতে পারিতেন। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না কেন?" বুযুর্গ বলিলেন–"আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, হয়ত ততক্ষণে আমার মনে উদিত শুভ ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতে পারে এবং আমি নেক কাজটি হইতে বিরত থাকিতে পারি।"

(২) যাকাত একবারে দিতে হইলে মহররম মাসে দিবে। ইহা ফযীলতের মাস এবং বৎসরের আরম্ভ। অথবা রমযান মাসে দিবে। দানের সময় যত ফযীলতের হইবে দানের সওয়াবও তত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দাতা ছিলেন। তাঁহার সব কিছুই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করিয়া দিতেন। বিশেষত রমযান শরীফে তিনি নিজে কিছুই রাখিতেন না, যথাসর্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেন।

(৩) যাকাত গোপনে দিবে, প্রকাশ্যে দিবে না। তাহা হইলে রিয়া হইতে দূরে থাকিবে এবং ইখলাসের নিকটবর্তী হইবে। (একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কাজ করাকে ইখলাস বলে।) হাদীস শরীফে আছে, "গোপন দান আল্লাহ্‌র ক্রোধকে প্রশমিত করে।" হাদীস শরীফে আরও উক্ত আছে, "কিয়ামত দিবস সাত প্রকার লোক আরশের ছায়াতলে থাকেবে তন্মধ্যে এই দুইটি উল্লেখযোগ্য– (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ্, (২) এমন দাতা যে দক্ষিণ হস্তে এরূপে দান করে যাহাতে বাম হস্ত জানিতে না পারে।" এখন ভাবিয়া দেখ গোপন দানের মরতবা কত অধিক ; গোপনে দানকারী কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারক বাদশাহের সমকক্ষ শ্রেণীতে স্থান পাইবে। হাদীস শরীফে আছে, "যে দান প্রকাশ্যে করা হইবে তাহা প্রকাশ্য আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইবে এবং গোপনে প্রদত্ত দান গুপ্ত আমলের মধ্যে লিখিত হইবে। আর যে ব্যক্তি দান করিয়া বলে, "আমি দান করিলাম, তাহার দান প্রকাশ্য দান ও গুপ্ত উভয় তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলা হইবে এবং রিয়ার তালিকায় লিপিবদ্ধ হইবে।" এইজন্যই

পূর্বকালের বুযর্গগণ গোপনে দান করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। কোন কোন বুযুর্গ অন্ধ ফকির অনুসন্ধান করত গোপনে তাহাকে দান করিতেন এবং মুখে কিছুই বলিতেন না যেন সে দাতাকে চিনিতে না পারে। কোন কোন বুযর্গ ফকিরদের চলার পথে তাহাদের অগোচরে কিছু অর্থ রাখিয়া দিতেন। আবার কেহ কেহ অন্যের মারফত ফকিরদিগকে দান করিতেন। কেহ কেহ আবার নিদ্রিত ফকিরের কাপড়ের কোণে চুপে চুপে এমনভাবে অর্থ বাঁধিয়া দিতেন যেন তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হয় ; ফকিরগণও যেন দাতাকে চিনিতে না পারে এইজন্যই তাঁহারা এরূপ করিতেন এবং অপর লোক হইতে দান গোপন রাখাকে তাঁহারা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেন। কারণ, প্রকাশ্যে দান করিলে হৃদয়ে রিয়া জন্মে। এইরূপ দানে কৃপণতা দূর হয় বটে, কিন্তু হৃদয়ে রিয়া প্রবল হইয়া উঠে। কৃপণতা, রিয়া ইত্যাদি কুস্বভাবসমূহ মানবাত্মা ধ্বংস করে। কৃপণতা বিচ্ছুতুল্য এবং রিয়া সর্প সদৃশ। সর্প বিচ্ছু অপেক্ষা প্রবল ও মারাত্মক। বিচ্ছুকে সর্পের আহারস্বরূপ প্রদান করিলে উহা খাইয়া সর্প অধিক বলবান হইয়া উঠবে। ইহাতে একটি মারাত্মক শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু অপর একটি অধিকতর মারাত্মক শত্রুর কবলে পতিত হইতে হইল। এই সকল দোষ হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে তাহা মৃত্যুর পর সাপ-বিচ্ছুর দংশনজনিত ক্ষতের ন্যায় প্রকাশ পাইবে। এই বিষয় দর্শন পুস্তকে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশ্য দানে উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক।

(৪) যাহার রিয়ার আশঙ্কা মোটেই নাই এবং যে ব্যক্তি রিয়ার আপদ হইতে স্বীয় হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইয়াছেন এমন বুযুর্গ ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, প্রকাশ্যে দান করিলে অপর লোকের মনেও দানের স্পৃহা জাগিয়া উঠিবে এবং তাঁহার দেখাদেখি তাহারাও গরীব-দুঃখীদের অভাব মোচনে ব্রতী হইবে, তবে তাঁহার পক্ষে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। যাহাদের নিকট প্রশংসা ও তিরস্কার এবং নিন্দা ও সুখ্যাতি সমান, কেবল তাঁহারাই এই উন্নত শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত আছেন ইহাকেই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।

(৫) দান করত দান গ্রহণকারীর উপকার করা হইল বলিয়া আস্ফালন করিয়া এবং দানের কথা লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া বেড়াইয়া দানের সওয়াব নষ্ট করিবে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى -

অর্থাৎ "দান গ্রহণকারীকে দানের খোঁটা দিয়া এবং কথায় কষ্ট প্রদান করিয়া তোমাদের দানসকল নষ্ট করিও না।" من واذى শব্দের অর্থ ফকিরগণকে দুঃখিত ও বিরক্ত করা। ইহা বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে ; যেমন, তাহাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার

করা, নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করা, কর্কশ কথা বলা, দরিদ্র বলিয়া ও কিছু চাহিতেছে জানিয়া তাহাদিগকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত মনে করা এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন করা। ধনীলোকদের এইরূপ আচরণ দুই প্রকার অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে হইয়া থাকে–(ক) হাত হইতে ধন বাহির করা তাহাদের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই সঙ্কীর্ণমনা হইয়া কর্কশ কথা বলিয়া থাকে। একগুণ দান করত সহস্রগুণ লাভ করে যাহার নিকট অপ্রীতিকর বাস্তবিকই সে মূর্খ ও নির্বোধ। কারণ সামান্য যাকাত প্রদান করিলে পরকালে বেহেশ্‌ত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হইবে এবং নিজকে দোযখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে–এই কথাগুলির প্রতি যাহাদের ঈমান আছে তাহাদের নিকট যাকাত দেওয়া অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে কেন? (খ) ধনীরা ধনের কারণে নিজদিগকে গরীব-দুঃখী অপেক্ষা মর্যাদাশীল মনে করে ; অথচ তাহারা জানে না যে, গরীবগণ ধনীদের অপেক্ষা কত অধিক মর্যাদাশীল এবং তাহারা কত উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ্‌র নিকটও দারিদ্রতার মর্যাদা আছে, ঐশ্বর্যের কোন মর্যাদা নাই। গরীবগণ যে ধনীদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী দুনিয়াতে ইহার প্রমাণ ও নিদর্শন এই, আল্লাহ্ ধনীদিগকে প্রতিনিয়ত দুনিয়া ও ধনের চিন্তায় ব্যাপৃত রাখিয়াছেন এবং ধনের হিফাজতের দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তার ভার তাহাদের উপরই অর্পণ করিয়াছেন। অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়ার কোন কিছুই উপভোগ করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। অপরপক্ষে গরীবদিগকে তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করা ধনীদের উপর আল্লাহ্ ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ বাস্তব পক্ষে ধনীদিগকে দুনিয়াতে গরীবদের বেতনবিহীন খাদেমরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আবার পরলোকেও গরীবগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং ধনীরা তৎপর পাঁচশত বৎসর অপেক্ষা করিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিবে।

(৬) দান করত দান-গ্রহণকারীর উপকার করিয়াছ বলিয়া মনে করিবে না। এইরূপ মনে করা অন্তরের একটি দোষ এবং মূর্খতার কারণেই লোকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। দান করিয়া যদি ধারণা কর, আমি গরীবের মঙ্গল সাধন করিয়াছি, আমার অধিকারের ধন তাহাকে দান করিলাম যেন সে আমার অধীনে থাকে, তবেই বুঝা যাইবে যে, তুমি তাহার উপকার করিয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ। আর এইরূপ মনে করিলে বুঝা যায় যে, তুমি আশা করিতেছ, গরীবেরা আমার খেদমত অধিক করুক, সর্বদা আমার কাজের জন্য প্রস্তুত থাকুক, সর্বাগ্রে আমাকে সালাম করুক ; মোটকথা, আমাকে অধিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমার গৌরব বৃদ্ধি করুক। দান গ্রহণকারীর কোন প্রকার ত্রুটি হইলে দাতা পূর্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় প্রকাশ করে এবং বলে, আমি তাহার এই উপকার করিলাম, তথাপি সে আমার অনুগত হইল না!

এইরূপ ধারণা করা নিতান্ত মূর্খতা। বাস্তবপক্ষে গরীবেরাই ধনীদের দান গ্রহণপূর্বক তাহাদিকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইয়া ও তাহাদের অন্তরকে কৃপণতার অপবিত্রতা হইতে পাক করিয়া তাহাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে এবং ধনীদের প্রতি তাহাদের ভালবাসার পরিচয় দিয়াছে। কোন বৈদ্য বিনা পারিশ্রমিকে সিঙ্গা লাগাইয়া কোন ধনী ব্যক্তির শরীর হইতে মারাত্মক দূষিত রক্ত যাহা তাহার প্রাণনাশের কারণ হইত তাহা বাহির করিয়া দিলে সে উপকার স্বীকার করত বৈদ্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকে। এইরূপ ধনীর অন্তরের কৃপণতা এবং তাহার নিকট রক্ষিত যাকাতের মালও তাহার ধ্বংসের ও অপবিত্রতার কারণ ছিল। গরীবেরা তাহার দান গ্রহণের কারণেই সে পবিত্রতাও লাভ করিল এবং ধ্বংসের হাত হইতেও রক্ষা পাইল। এইজন্য গরীবদের উপকার স্বীকার করত তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ধনীদের কর্তব্য। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দান প্রথমে আল্লাহ্‌র রহমতের হস্তে গমন করে। তৎপর গরীবদের হাতে আসে।" অতএব দান আল্লাহ্‌কে দেওয়া হয় এবং গরীব ব্যক্তি তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ ইহা গ্রহণ করে। এই কারণেও গরীবের প্রতি দাতার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ; দান গ্রহণকারীর উপকার করিয়াছে বলিয়া বেড়ান উচিত নহে।

যাকাতের উল্লিখিত তিনটি তাৎপর্যের প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝা যাইবে যে, দান করিয়া গরিবের উপকার করা হইল বলিয়া মনে করা এবং ইহা বলিয়া বেড়ান নিতান্ত মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। পূর্বকারের বুযর্গগণ উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা দরিদ্রের সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার সহিত দাঁড়াইতেন এবং দানের বস্তু তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেন। আর দানের বস্তু হাতে লইয়া গরীবদের সম্মুখে এইরূপে স্থাপন করিতেন যেন তাহারা উপর হইতে উহা তুলিয়া লইতে পারে এবং গরীবদের হাত তাঁহাদের হাতের নিজে না যায়। কারণ,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلٰى -

অর্থাৎ "উপরের হাত নিচের হাত হইতে উৎকৃষ্ট।" এমতাবস্থায় দান করিয়া বলিয়া বেড়ান এবং উপকার করা হইল বলিয়া প্রতিদান আশা করা কাহার পক্ষে শোভা পাইতে পারে?

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা এবং হযরতে উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা দরিদ্রকে কোন কিছু পাঠাইবার সময় যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন, "দরিদ্র ব্যক্তি যে দু'আ করিবে তাহা স্মরণ রাখিও। তাহা হইলে প্রতিদানে আমরাও তাহার জন্য দু'আ করিব যেন আমাদের দান প্রতিদানবিহীন ও খাঁটি থাকে।"

দান করিয়া গ্রহণকারী দু'আর প্রত্যাশা করাও তাঁহারা জায়েয মনে করিতেন না। কারণ, দাতা উপকার করিয়াছে, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রহণকারী দু'আ করিয়া থাকে। অথচ দরিদ্রগণই ধনীদের দান গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপকার করে।

(৭) নিজের মাল হইতে খুব উৎকৃষ্ট ও হালাল বস্তু দরিদ্রদিগকে দান করিবে। যে মালের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাহা আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করার যোগ্য নহে। কারণ, আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং পবিত্র বস্তুই তিনি কবূল করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -

অর্থাৎ, "এমন মন্দ বস্তু দান করিতে ইচ্ছা করিও না যাহার প্রতি চক্ষুমুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরাও ইহা গ্রহণ করিবে না।" (সূরা বাকারা, রুকূ ৩৭)। গৃহের নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র পথে দান করা ও উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁহার বান্দার জন্য রাখিয়া দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইবে? নিকৃষ্ট বস্তু দান করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঘৃণার সহিত দান করা হইতেছে এবং সন্তুষ্টচিত্তে দান না করিলে ইহা কবূল না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দানের এক দিরহাম হাজার দিরহামের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। উহা এমন দিরহাম যাহা উৎকৃষ্ট এবং সন্তুষ্টচিত্তে দান করা হয়।

যাকাতের উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধানের নিয়ম ঃ যে কোন মুসলমান গরীবকে যাকাত দিলে ফরয আদায় হইয়া যাইবে বটে; কিন্তু পরকালের ব্যবসায়ীর পক্ষে উপযুক্ত গরীবের অনুসন্ধানে ত্রুটি করা উচিত নহে। উপযুক্ত পাত্রে যাকাত দিলে উহার সওয়াবও দ্বিগুণ পাওয়া যাইবে। অতএব, নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি গুণের মধ্যে অন্তত একটি গুণ যাহার মধ্যে আছে, এমন দরিদ্র অনুসন্ধান করিয়া যাকাত দেওয়া উচিত।

প্রথম গুণ ঃ পরহিযগারী ও আল্লাহ্-ভীরুতা। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ভীরু লোকদিগকে তোমাদের খাদ্য আহার করাও।" কারণ, এই শ্রেণীর লোক যাহা গ্রহণ করিবেন তাহা কেবল আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে ব্যয় করিবেন এবং ইবাদতে সাহায্য করার জন্য দাতাও তাঁহাদের ইবাদতের সওয়াবে অংশী হইয়া থাকে। এক ধনী ব্যক্তি সর্বদা সূফিগণকে দান করিতেন এবং বলিতেন, "তাঁহারা

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুরই অভিলাষী নহেন। অভাব হইলে তাঁহাদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। আমি এরূপ একটি হৃদয় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করাকে দুনিয়া অর্জনে অভিলাষী একশতজনকে উপকার করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি।" এই ধনী ব্যক্তির অবস্থা লোকে হযরত জুনাইদ (র)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন, "এই ব্যক্তি বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত।" এই ব্যক্তি প্রথমে খাদ্যশস্যের ব্যবসা করিতেন। দরিদ্র লোকেরা তাঁহার দোকান হইতে যাহা কিছু ক্রয় করিত তিনি তাহার মূল্য লইতেন না। এইজন্য তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ও নিঃস্ব হইয়া পড়েন। হযরত জুনাইদ (র) কিছু মূলধন দিয়া পুনরায় তাঁহাকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দেন এবং বলেন–"তোমার মত লোকের ব্যবসায় কখনও ক্ষতি হইবে না।"

দ্বিতীয় গুণ ঃ ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থী হওয়া। ইল্‌মে দীন শিক্ষার্থীকে দান করিলে তাহারা ইল্‌ম শিক্ষার সুযোগ পাইবে এবং দাতা ইল্‌ম শিক্ষার সওয়াবের অংশী হইবে।

তৃতীয় গুণ ঃ নিজের অভাব ও দরিদ্রতা গোপন রাখা এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা। এই স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ -

অর্থাৎ "কিছু চায় না বলিয়া মূর্খ লোক তাহাদিগকে ধনী বলিয়া মনে করে।" এই শ্রেণীর লোকে নিজেদের দারিদ্রতা আড়ম্বর ও মর্যাদার আবরণে ঢাকিয়া রাখেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া ভিক্ষাজীবী ফকিরদিগকে দান করা উচিত নহে।

চতুর্থ গুণ ঃ বহু পোষ্য থাকা ও রোগাক্রান্ত হওয়া। কারণ, যে দরিদ্রের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট যত অধিক তাহাকে সেই পরিমাণে শান্তি প্রদান করিলে সওয়াবও তত অধিক হইবে।

পঞ্চম গুণ ঃ আত্মীয়তা। দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে দান করিলে দানের সওয়াব তো হইবেই, তদুপরি আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের কারণে যাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মে তাহারাও আত্মীয়ের অন্তর্গত।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকার গুণ যাহার মধ্যে যত অধিক পাওয়া যায় তিনিই দান গ্রহণের জন্য তত অধিক সৎপাত্র। এই প্রকার লোকদিগকে দান করিলে দাতার জন্য তাহাদের দু'আ বিপদাপদ হইতে দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ হইবে। দান করাতে হৃদয়ের কৃপণতা বিদূরিত এবং নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা তো প্রকাশ করা হইবেই, তদুপরি এই লাভও হইবে। সৈয়দ বংশের লোকদিগকে যাকাত দিবে না। কারণ, যাকাত ধনের ময়লা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধরগণের মর্যাদাও এত উচ্চ যে, তাঁহারা যাকাত গ্রহণের উপযোগী নহে। কাফিরকেও যাকাত দিবে না। কারণ, তাহারা এত অপবিত্র যে, মুসলমানের ধনের ময়লা গ্রহণেও উপযুক্ত নহে।

যাকাত গ্রহণকারীর কর্তব্য ঃ পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা যাকাত গ্রহণকারীর কর্তব্য।

(১) ভালরূপে বুঝিয়া লইবে যে, আল্লাহ্ তাহার কতক বান্দাকে দরিদ্র করিয়াছেন বলিয়াই অপর কতক বান্দাকে ধনবান করিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তাহার দয়া অধিক তাহাদিগকেই তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদের ঝঞ্ঝাট হইতে রক্ষা করিয়াছেন; আর ধন অর্জনের দায়িত্ব ও ইহার রক্ষণাবেক্ষণের কষ্ট ধনীদের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ধনীদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন, "আমার দরিদ্র প্রিয়পাত্রগণকে তাহাদের আবশ্যক অনুযায়ী দান কর যেন তাহারা দুনিয়ার চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত করিতে পারে এবং অভাবে পড়িয়া দরিদ্রদের মন যখন অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে তখন ধনীরা যেন তাহাদের অভাব মোচনের উপযোগী ধন তাহাদিকে দান করে।" তাহা হইলে দরিদ্রদের দু'আর বরকতে ধন-সম্পদ বিষয়ে ধনীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। সুতরাং কেবল নিজের অভাব দূর করত নিরুদ্বিগ্ন মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করা দরিদ্রের কর্তব্য এবং তাহারা যেন সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকে। এই উদ্দেশ্যেই যে আল্লাহ্ ধনীদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক বিহীন খাদেমরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহাদের উচিত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। দুনিয়ার বাদশাহ্ যেমন তাঁহার ভৃত্যগণের মধ্যে যাহাকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া তাহা হইতে বিশেষ খেদমত লাভের ইচ্ছা করেন তাহাকে জীবিকা অর্জনের জন্য বিদায় দেন না এবং বিশেষ খেদমতের অনুপযুক্ত কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে তাহার পারিশ্রমিকবিহীন মজুররূপে নিযুক্ত করেন ও তাহাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় করত পার্শ্বচরের বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন তদ্রূপ আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রিয়পাত্রদের খেদমতের জন্য তাঁহার অপর বান্দাগণকে নিযুক্ত রাখেন। দুনিয়ার বাদশাহ্ প্রজাবৃন্দ হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্রদের খেদমত লাভের আশা করে, কিন্তু আল্লাহ্র সকল সৃষ্টির ইবাদত পাইবার আশা করেন। এইজন্য তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থাৎ "একমাত্র আমার ইবাদত করিবার জন্যই আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি।" অতএব দরিদ্রগণ যাহা গ্রহণ করিবে তাহা একমাত্র নিরুদ্বেগে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করিবে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দান গ্রহণকারী যদি অভাব মোচনপূর্বক নিশ্চিত মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করে তবে গ্রহণকারী অপেক্ষা দাতার মর্যাদা অধিক নহে।

(২) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতেছ বলিয়া মনে করিবে এবং দাতাকে আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ বলিয়া জানিবে। কারণ, ধনী ব্যক্তি, অভাবগ্রস্তকে দান করে কিনা দেখিবার জন্য আল্লাহ্ তাহার উপর এক পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই পরিদর্শক হইল ঈমান। ঈমানের প্রেরণায়ই দাতা দান করিয়া থাকে। কেননা, তাহার পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য দানের উপরই নির্ভর করে। ঈমানরূপ পরিদর্শক তাহার সহিত নিযুক্ত না থাকিলে ধনী ব্যক্তি একটি শস্যকণাও দান করিত না। ধনীর সহিত যিনি এইরূপ পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন তিনি দরিদ্রের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। দাতার হস্ত দানের মাধ্যমমাত্র; উহার স্বাধীন ক্ষমতা নাই, বরং আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে ইহা পরিচালিত হয়। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দান গ্রহণকারীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে ঃ

فَاِنَّ مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" মানুষের সকল কার্যের প্রকৃত কর্তা একমাত্র আল্লাহ্। তথাপি তিনি নিজ বান্দাগণের প্রশংসা করিয়া তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন ; যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ـ

অর্থাৎ "সে কত উত্তম বান্দা! সে নিশ্চয়ই তওবাকারী" তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তিনি সিদ্দীক নবী ছিলেন।" এই প্রকার আরও আয়াত কুরআন শরীফে আছে। এই সকল প্রশংসাবাদের কারণ এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে নেক কার্যের উপলক্ষ বানাইয়াছেন তাহাকে তিনি সম্মানিত করিয়াছেন; যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র যবানে বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ خَلَقْتُهٗ لِلْخَيْرِ وَيَسَّرْتُ الْخَيْرَ عَلٰى يَدَيْهِ ـ

অর্থাৎ "যাহাকে আমি নেক কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং যাহার হস্তদ্বয়কে নেক কার্যের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি, তাহার জন্য শুভ সংবাদ।" যাঁহাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহার মর্যাদা অবগত হইয়া তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও উচিত। ইহাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অর্থ। দাতার জন্য দানগ্রহণকারীকে এইরূপ দু'আ করা উচিত ঃ

طَهَّرَ اللّٰهُ قَلْبَكَ فِى قُلُوْبِ الْاَبْرَارِ وَزَكّٰى عَمَلَكَ فِىْ عَمَلِ الْاَخْيَارِ وَصَلّٰى عَلٰى رُوْحِكَ فِىْ رُوْحِ الشُّهَدَاءِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আপনার অন্তর পবিত্র করত নেককারগণের অন্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত করুন, আপনার কার্যকে পবিত্র করত নেককার লোকদের কার্যাবলীর শ্রেণীভুক্ত করুন এবং আপনার আত্মার উপর রহমত বর্ষণ করত শহীদগণের আত্মার শ্রেণীভুক্ত করুন।" হাদীস শরীফে উক্ত আছে, "কেহ তোমার উপকার করিলে উহার বিনিময়ে তুমিও তাহার উপকার কর। অক্ষম হইলে তাহার জন্য এই পরিমাণে দু'আ কর যাহাতে বুঝিতে পার যে, উহার প্রতিদান পূর্ণ হইয়াছে।" প্রচুর দান করিয়াও দাতা উহাকে নগণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে। অপর পক্ষে দান গ্রহণকারী দানের বস্তু নিতান্ত অল্প হইলেও অল্প ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিবে না এবং দানের ঘোষ গোপন রাখিবে। ইহাই তাহার পক্ষে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা।

(৩) হারাম মাল কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অত্যাচারী ও সুদ-খোরের মালও লইবে না।

(৪) আবশ্যক পরিমাণ গ্রহণ করিবে। সফরের জন্য গ্রহণ করিলে পাথেয় ও ভাড়ার অতিরিক্ত গ্রহণ করিবে না। ঋণ পরিশোধের জন্য লইলে ঋণের পরিমাণই লইবে। পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য দশটি মুদ্রা যথেষ্ট হইলে এগারটি লইবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুদ্রাটি লওয়া হারাম। গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় থাকিলে যাকাতের মাল গ্রহণ করা উচিত নহে।

(৫) যাকাত দাতা আলিম না হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "আপনি যাহা দান করিতেছেন, মিসকিনের অংশ দান করিতেছেন, না ঋণগ্রস্তের অংশ?" দাতা যে শ্রেণীর অংশ দান করিতেছেন গ্রহণকারী সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে ; অন্যথায় নহে। দাতা সমস্ত যাকাতের আটভাগের একভাগ সম্পূর্ণই একজনকে দিলে তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে; কারণ, শাফেঈ মাযহাব মতে ইহা সঙ্গত নহে। (হানাফী মতে সমস্ত যাকাত একজনকেও দেওয়া যাইতে পারে)।

সদকা-খয়রাতের ফযীলত ঃ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"একটি খুরমার অংশ হইলেও দান কর। কারণ, ইহা দরিদ্রকে জীবিত রাখে এবং পাপকে এমনভাবে বিনাশ করে যেমন পানি অগ্নি নির্বাপিত করে।" তিনি বলেন–"একটি খুরমার অর্ধাংশ দান করিয়া হইলেও দোযখ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর। তাহাও অসাধ্য হইলে অন্তত মিষ্ট কথা বলিয়া বাঁচিবার চেষ্টা কর।" তিনি

বলেন–"যে মুসলমান নিজের হালাল মাল হইতে দান করে আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় করুণায় এমনিভাবে প্রতিপালন করেন যেমন তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশুকে প্রতিপালন করিয়া থাক, এমনকি তাহার কতিপয় খুরমা ওহুদ পাহাড়ের সমান হইয়া যায়।" তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন সকলের বিচার সমাপ্ত হইয়া শেষ আদেশ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দাতা নিজ নিজ দানের ছায়াতলে অবস্থান করিবে।" তিনি বলেন–"দান অমঙ্গলের দ্বারসমূহের মধ্য হইতে সত্তরটি দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়।" লোকে নিবেদন করিল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দান সর্বোৎকৃষ্ট?" তিনি বলিলেন–"সুস্থ দেহে আরও বাঁচিবার আশা থাকাকালীন দারিদ্রতার ভয় না করিয়া দান করা সর্বোৎকৃষ্ট। দানে গড়িমসি করিতে করিতে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়া 'ইহা অমুকতে দাও; উহা অমুককে দাও' বলা শ্রেয় নহে। কারণ, এ সময় সে দান করুক বা না করুক তাহার সমস্ত মাল আপনা-আপনিই অপরের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িবেই।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে ফকিরকে বঞ্চিত করিয়া ফিরাইয়া দেয় সাত দিন পর্যন্তই সেই গৃহে ফেরেশতা গমন করে না।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইটি কাজ অপরের উপর ছাড়িতেন না, স্বয়ং নিজ হস্তে করিতেন। যথা (১) নিজ হস্ত মুবারকে দরিদ্রকে দান করিতেন এবং (২) তাহাজ্জুদের ওযূর জন্য পানি সংগ্রহ করত নিজে ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করাইবে সেই বস্ত্র যতদিন তাহার পরিধানে থাকিবে ততদিন দাতা আল্লাহ্র হিফাজতে থাকিবে।" হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম পর্যন্ত গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিতেন অথচ, তাঁহার পরিধানে তালি দেওয়া জামা থাকিত; তথাপি তিনি নূতন জামা তৈয়ার করাইয়া লইতেন না। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহ আনহু বলেন যে, এক ব্যক্তি সত্তর বৎসর ইবাদত করিয়াছিলেন ; একবার তাঁহার দ্বারা এত বড় এক পাপকর্ম সংঘটিত হইয়া পড়িল যে, তাঁহার সত্তর বৎসরের ইবাদত নষ্ট হইয়া গেল। সে ব্যক্তি এক ফকিরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাকে একটি রুটি দান করিলেন। ফল-স্বরূপ, আল্লাহ্ তাঁহার মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং উক্ত সত্তর বৎসরের ইবাদতের সওয়াব তাঁহাকে প্রদান করিলেন। লুকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিলেন, "হে বৎস, যখনই তোমার দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয় তখনই দান করিবে।" হযরত ইবনে উমর রাদিয়াআল্লাহু আনহু প্রচুর পরিমাণে চিনি দান করিতেন এবং বলিতেন যে, আল্লাহ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই নেকী পাইবে না।" আর আল্লাহ্ জানেন যে, আমি চিনি পছন্দ করি।" হযরত শা'আবী (র) বলেন–"দরিদ্রের জন্য দানের বস্তু যত আবশ্যক, দানের সওয়াব দাতার জন্য তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক, এই কথা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে না তাহার দান কবূল হয় না।" হযরত হাসান বসরী (র) এক দাস-বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী দাসী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"দুই দিরহাম মূল্যে তাহাকে কি বিক্রয় করিবে?" "সে বলিল–"না।" তিনি বলিলেন–"যাও, আল্লাহ্ দুই দিরহামের পরিবর্তে এমন পরমা সুন্দরী হুর দান করেন যাহা তোমার দাসী অপেক্ষা বহু গুণে অধিক সুন্দরী।" অর্থাৎ দুই দিরহাম দানের বিনিময়ে আল্লাহ্ বেহেশতে সেইরূপ পরমা সুন্দরী হুর দান করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযা

রোযা ইসলামে অন্যতম ভিত্তি। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ বলিয়াছেন, প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব আমি দশ হইতে সাতশত পর্যন্ত দিয়া থাকি। কিন্তু রোযা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয় বলিয়া আমি স্বয়ং ইহার প্রতিদান। আল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থাৎ "বাসনা-কামনা দমনকারীদিগকে আল্লাহ্ উহার বিনিময়ে যাহা প্রদান করিবেন তাহা অসংখ্য, অপরিমিত ও অসীম।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সবর ঈমানের অর্ধেক এবং রোযা সবরের অর্ধেক।" তিনি বলেন– "রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মৃগ-নাভীর সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন– "আমার বান্দা কেবল আমার জন্যই পানাহার স্ত্রী-সহবাস বর্জন করিয়াছে। একমাত্র আমিই ইহার বিনিময় প্রদান করিতে পারি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "রোযাদারের নিদ্রা ইবাদত ও শ্বাস-প্রশ্বাস তসবীহস্বরূপ এবং তাহার দু'আ নির্ঘাৎ গ্রহণযোগ্য।" তিনি বলেন–"রমযান মাসের আগমনে বেহেশতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত, দোযখের দরজাসমূহ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানগণকে বন্দী করা হয় ও এক ঘোষণাকারী ডাকিয়া বলে–"হে কল্যাণকামী, তাড়াতাড়ি আস; এখন তোমার সময়। আর হে পাপী, ক্ষান্ত হও, এখন তোমার স্থান নাই।" রোযার বড় ফযীলত এই যে, আল্লাহ্ ইহাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

অর্থাৎ "কোবল আমার উদ্দেশ্যেই রোযা রাখা হয় এবং আমি ইহার বিনিময় প্রদান করিব।" সমগ্র বিশ্বজগত আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত হইলেও কা'বা শরীফকে যেমন তাঁহার গৃহ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকিলেও রোযাকে তাঁহার নিজের বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইখানেই রোযার বিশেষত্ব।

রোযা আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার কারণ ঃ দুইটি বিশেষত্বের কারণে রোযা বেনিয়ায আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার উপযোগী হইয়াছে– (১) রোযার মূলতত্ত্ব হইল বাসনা-কামনা পরিত্যাগ করা এবং ইহা লোকচক্ষু হইতে সম্পূর্ণ গুপ্ত অন্তরের কার্য। সুতরাং ইহাতে রিয়ার অবকাশ নাই। (২) শয়তান আল্লাহ্র শত্রু এবং বাসনা-কামনা শয়তানের সৈন্য। রোযা শয়তানের সৈন্যকে পরাজিত করে। কারণ বাসনা-কামনা বর্জনই হইল রোযার গূঢ় মর্ম। এইজন্যই রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মানব শরীরে রক্ত যেরূপ চলাচল করে শয়তান তদ্রূপ তাহার অন্তরে চলাচল করে। সুতরাং ক্ষুধার্ত থাকিয়া শয়তানের পথ দুর্গম করিয়া দাও।" তিনি আরও বলেন ঃ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ অর্থাৎ "রোযা ঢালস্বরূপ।" হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন– 'বেহেশতের দরজায় খটখটাইতে থাক।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"কোন জিনিস দ্বারা?" তিনি বলিলেন–"ক্ষুধা দ্বারা।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"রোযা ইবাদতের দরজা।" রোযার এত ফযীলতের কারণ এই –বাসনা-কামনা সকল ইবাদাতের প্রতিবন্ধকতা এবং তৃপ্তির সহিত ভোজনে বাসনা-কামনা প্রবল হইয়া উঠে; আর ক্ষুধা বাসনা-কামনাকে বিনাশ করে।

রোযার ফরযসমূহ ঃ রোযার মধ্যে ছয়টি কাজ ফরয। (১) রমযান মাসের নবচন্দ্রের অন্বেষণ করা। রমযান শরীফের চাঁদ দেখা গেলেই রোযার মাস আরম্ভ হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে পূর্ববর্তী শা'বান মাসের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে– ইহার ঊনত্রিশ দিন হইয়াছে কি ত্রিশ দিন হইয়াছে। ত্রিশ পূর্ণ হইলে পর দিন হইতেই রমযান মাস ধরিতে হইবে। উভয় অবস্থাতেই পরদিন রোযা রাখা ফরয। একজন পরহিযগার ন্যায়পরায়ণ মুসলমান নিজে চাঁদ দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিলে তাহা বিশ্বাস করত তদনুযায়ী কাজ করা জায়েয আছে। কিন্তু ঈদের চাঁদ সম্বন্ধে দুইজন তদ্রূপ মুসলমানের সাক্ষ্য পাওয়া গেলে রোযা ভঙ্গ করা দুরস্ত নহে। রমযানের চাঁদ উঠিয়াছে বলিয়া কোন বিশ্বস্ত সত্যবাদী লোকের নিকট কেহ শুনিতে পাইলে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য কাযীর নিকট অগ্রাহ্য হইলেও শ্রোতার প্রতি রোযা রাখা ফরয হইবে। (২) রোযার নিয়ত করা। প্রত্যেক রাত্রে রোযার নিয়ত করা উচিত এবং মনে রাখিতে হইবে–আমি বর্তমান রমযান মাসের ফরয রোযা পালন করিতেছি। যে মুসলমান এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবে তাহার অন্তর নিয়তশূন্য থাকিবে না। প্রথম রাত্রে চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে যদি কেহ এইরূপ নিয়ত করে, 'আগামীকল্য রমযান হইলে আমি রোযা রাখিলাম, তবে পরদিন রমযান হইলেও এরূপ নিয়ত দুরস্ত নহে। কিন্তু কোন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্যে সন্দেহ দূর হইলে দুরস্ত হইবে। আর রমযানের শেষ

তারিখে ঈদের চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে তদ্রূপ নিয়ত করা দুরস্ত আছে। কারণ কখনও রমযান মাস বাকি থাকে। অন্ধকারে আবদ্ধ ব্যক্তি চাঁদ দেখিতে অক্ষম হইয়া অনুমান করত চন্দ্রোদয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে যদি রোযার নিয়ত করে তবে দুরস্ত হইবে। রাত্রে নিয়ত করিবার পর সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছু আহার করিলে নিয়ত ভঙ্গ হইবে না। ঋতুবতী স্ত্রীলোক যদি মনে করে, আগামীকল্য ঋতু বন্ধ হইবে এবং এই অনুমানের উপর নির্ভর করত রাত্রে রোযার নিয়ত করে আর ঋতুও বন্ধ হইয়া যায় তবে তাহার রোযা দুরস্ত হইবে। (৩) বাহিরের কোন জিনিস ইচ্ছাপূর্বক শরীরের ভিতরে প্রবেশ না করান। শিরা হইতে রক্ত বাহির করা। ('ফাসদ লওয়া), সিঙ্গা লাগান, সুরমা ব্যবহার করা, কানে কাঠি প্রবেশ করান, লিঙ্গের ছিদ্রে তুলা স্থাপন করা ইত্যাদি কার্যে রোযা নষ্ট হইবে না। কারণ, শরীরের ভিতর বলিতে তাহাই উদ্দেশ্য যাহাতে কোন জিনিস স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারে ; যেমন, মস্তিষ্ক, উদর, পাকস্থলী, মূত্রাধার ইত্যাদি। কিন্তু বিনা ইচ্ছায় কোন জিনিস গলার ভিতর চলিয়া গেলে রোযা নষ্ট হইবে না, যেমন মাছি, ধূলা বা কুলির পানি। কিন্তু কুলি করিবার সময় বাড়াবাড়ি করত গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করাইলে রোযা নষ্ট হইবে। ভুলবশত হঠাৎ কোন বস্তু গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হইবে না। কিন্তু সুবহে সাদিক হয় নাই বা সূর্যাস্ত হইয়াছে মনে করত কিছু আহার করিলে পরে যদি জানা যায় যে, সুবহে সাদিক হইয়া গিয়াছে বা সূর্যাস্ত হয় নাই, তবে এই উভয় অবস্থাতেই রোযা নষ্ট হইবে এবং উহার কাযা আদায় করিতে হইবে। (৪) স্ত্রী সহবাস না করা। স্ত্রী-পুরুষের যতটুকু নৈকট্য হইলে গোসল ফরয হয়, রোযা রাখিয়া ততটুকু নৈকট্য হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু ভুলক্রমে এইরূপ হইলে রোযা ভাঙ্গিবে না। রাত্রে স্ত্রী-সহবাস করলে সুবহে সাদিকের পর গোসল করিলে রোযা দুরস্ত হইবে। (৫) কোন প্রকার শুক্রস্খলন বা ইহার ইচ্ছা না করা। স্ত্রী-পুরুষের নৈকট্য অর্থাৎ স্পর্শ আকর্ষণ, ঘর্ষণ, চুম্বন প্রভৃতি কাজে, সঙ্গম না করিয়াও, যদি স্বামী যুবক হয় ও শুক্রপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং অবশেষে শুক্রপাত হইয়া যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হইবে। (৬) ইচ্ছাপূর্বক বমি না করা। অনিচ্ছায় বমি হইয়া গেলে রোযা নষ্ট হইবে না। যক্ষা বা অন্য কোন রোগের কারণে শ্লেষ্মা মিশ্রিত পানি উদ্‌গার হইলে এবং তৎক্ষণাৎ উহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। কেননা এইরূপ উদ্‌গার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কোন উপায় নাই। কিন্তু উত্থিত পানি গিলিয়া ফেলিলে রোযা নষ্ট হইবে।

রোযার সুন্নত ঃ রোযার সুন্নত ছয়টি। (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া (২) খুরমা বা পানি দ্বারা সময়মত তাড়াতাড়ি ইফতার করা।(৩) দ্বিপ্রহরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিসওয়াক না করা। (৪) দরিদ্রকে আহার প্রদান করা। (৫) অধিক পরিমাণে কুরআন

শরীফ তিলাওয়াত করা। (৬) মসজিদে ই'তেকাফ করা; বিশেষত রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করা। এই দশদিনের মধ্যেই শবে কদর রহিয়াছে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এই দশদিন বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিত্যাগ করত কেবল ইবাদতে রত থাকিতেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ সেই দশ দিন মুহূর্তকালও ইবাদত হইতে বিরত থাকিতেন না। রমযানের ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখে শবেকদর হইয়া থাকে। অধিকাংশ সময় ২৭ তারিখেই শবেকদর হয়। এই জন্য রমযানের শেষ দশ দিনের দিবারাত্র ই'তেকাফে লিপ্ত থাকা অতি উত্তম। মান্নত করিলে উহা পালন করা ওয়াজিব হইয়া পড়ে। পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন ব্যতীত ই'তেকাফের অবস্থায় মসজিদের বাহিরে যাইবে না। পায়খানা-পেশাবের পর ওযূর জন্য যতটুকু সময়ের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক সময় মসজিদের বাহিরে থাকিবে না। জানাযার নামায, পীড়িত লোককে দেখা, সাক্ষাৎ প্রদান বা নূতন ওযূর জন্য মসজিদের বাহিরে গেলে ই'তেকাফ ভঙ্গ হয় না। ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে হাত ধোয়া, আহার করা এবং নিদ্রা যাওয়া দুরস্ত আছে। পায়খানা-পেশাবের পর আবার নূতনভাবে ইতেকাফের নিয়ত করিয়া লইবে।

রোযার শ্রেণী বিভাগ ঃ রোযা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা–(১) সাধারণ লোকের রোযা, (২) মধ্যম শ্রেণীর লোকের রোযা ও (৩) উচ্চ শ্রেণীর লোকের রোযা। ইতঃপূর্বে রোযা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই সাধারণ লোকের রোযা। পাহানার, স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকিলেই রোযার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পন্ন হইল। ইহা সর্বনিম্ন শ্রেণীর রোযা। উচ্চ শ্রেণীর লোকের রোযাই সর্বোচ্চ শ্রেণীর রোযা। এই শ্রেণীর রোযার রোযাদারের হৃদয়কে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চিন্তা হইতে বিরত রাখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিতে হয় এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সমস্ত পদার্থের প্রতি অন্তরে ও বাহিরে একেবারে বিমুখ ও নির্লিপ্ত থাকিতে হয়। আল্লাহ্‌র কালাম ও ইহার আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে মন দিলে রোযা এই উন্নত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হয় না। পার্থিব আবশ্যক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যদিও অসঙ্গত নহে তথাপি ইহাতে রোযার এই উন্নততর মর্যাদা নষ্ট হয়। সাংসারিক যে কর্ম ধর্ম-কার্যের সহায়তা হয় তাহা বাস্তবপক্ষে দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নহে। তথাপি আলিমগণ বলেন, দিবাভাগে ইফতারের আয়োজন করিলে পাপ হইবে। কারণ, ইহাতে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ যে জীবিকা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন তৎপ্রতি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আম্বিয়া (আ) ও সিদ্দিকগণের রোযা এই উন্নত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সকলে এই উন্নত মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

মধ্যম শ্রেণীর লোকের রোযা ঃ কেবল পানাহার, স্ত্রী-সহবাস পরিত্যাগ করিলেই রোযা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপ ও অন্যায়

কাজ হইতে বিরত রাখিতে হইবে। ছয়টি বিষয়ে এই শ্রেণীর রোযার পূর্ণতা লাভ হয়। (১) যে সকল বস্তু দর্শন করিলে আল্লাহ্‌র দিক হইতে মন ফিরিয়া যায় উহা দর্শন না করা। বিশেষজ্ঞ কামভাব জাগ্রত করে এমন কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টিপাত করিবে না। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন– "শয়তানের তীরসমূহের মধ্যে চোখের দৃষ্টি একটি অতি বিষাক্ত তীর। আল্লাহ্‌র ভয়ে যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ দৃশ্যের দর্শন হইতে চক্ষুকে সংযত রাখিবে তাহার ঈমানকে এমন সুসজ্জিত করা হইবে যাহার মিষ্টতা সে তাহার অন্তরে অনুভব করিবে।" হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–"রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন– মিথ্যা কথন, গীবত, চুগলখোরী, মিথ্যা শপথ ও কামভাবে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা–এই পাঁচ কার্যে রোযা নষ্ট হয়।" (২) বেহুদা বক্‌বক ও বেফায়দা কথা হইতে রসনাকে সংযত রাখিয়া আল্লাহ্‌র যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা অথবা নীরব থাকা। তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-কলহ বেহুদা কথার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন আলিমের মতে গীবত ও মিথ্যা কথন সাধারণ লোকের রোযাও নষ্ট করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, দুইজন রোযাদার স্ত্রীলোক পিপাসায় মরণাপন্ন হইয়া রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিকট রোযা ভঙ্গের অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট পাত্র পাঠাইয়া উহাতে বমি করিতে বলিয়া দিলেন। উভয়ের গাল হইতে জমাট রক্তপিণ্ড বাহির হইল। লোকে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেলেন–"আল্লাহ্‌র যে বস্তু হালাল করিয়াছেন তাহা দ্বারা এই দুইজন স্ত্রীলোক রোযা রাখিয়াছিল এবং তিনি যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে ; অর্থাৎ তাহারা কাহারও গীবত করিয়াছে। এই রক্ত মানুষের মাংস যাহা তাহারা ভক্ষণ করিয়াছে।" (৩) অশ্লীল বাক্য শ্রবণ হইতে কর্ণকে বিরত রাখা। কারণ মন্দ কথা শুনাও উচিত নহে। গীবত ও মিথ্যা কথা যে শ্রবণ করে সেও যে ব্যক্তি গীবব করে ও মিথ্যা বলে তাহার পাপের শরীক হইয়া থাকে। (৪) হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কার্য হইতে বাঁচাইয়া রাখা। যে ব্যক্তি মন্দ কার্য করে সে এমন রোগীতুল্য, যে রোগের ভয়ে ফল ভক্ষণে বিরত থাকে অথচ বিষ পান করে। পাপই বিষ এবং খাদ্য খাইয়া মানুষ প্রাণ বাঁচায়। খাদ্য অধিক পরিমাপে খাইলেই অনিষ্ট হয় ; খাদ্যও মূলত অনিষ্টকর নহে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন–"এমন বহু রোযাদার আছে যাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ব্যতীত রোযা হইতে আর কোন কিছুই লাভ হয় না।" (৫) ইফতারের সময় হারাম বা সন্দেহজনক খাদ্য খাইবে না। হালাল খাদ্য ও অতিরিক্ত খাইবে না। কারণ, দিবারাত্রের নির্ধারিত খাদ্য রাত্রেই খাইয়া ফেলিলে রোযা রাখিয়া কি লাভ হইবে? কেননা, খাহেশ দমন করাই রোযার উদ্দেশ্য এবং দুইবারের খাদ্য

একবারে খাইলে খাহেশ অধিক বৃদ্ধি পায়। বিশেষত নানা প্রকার সুস্বাদু খাদ্য খাইলে খাহেশ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী খালি না হইলে অন্তর পরিষ্কার হয় না। বরং দিবাভাগে অধিক না ঘুমাইয়া জাগ্রত থাকা সুন্নত যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও দুর্বলতা প্রভাব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়। রাত্রে অল্প আহার করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন না করিলে তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায় না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন যে, পরিপূর্ণ উদর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ভাণ্ড। (৬) ইফতারের পর রোযা কবূল হইবে কিনা, এই ভয় রাখা। হযরত হাসান বসরী (র) ঈদের দিন একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা হাস্য-কৌতুক করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"আল্লাহ্ রমযান মাসকে ময়দানস্বরূপ বানাইয়াছেন যেন তাহার বান্দাগণের একদল ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা অপর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং একদল অপর দলকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। যাহারা হাস্য-কৌতুক করে ও নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহে তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্ময় লাগে। আল্লাহ্‌র শপথ যখন পর্দা বিদূরিত হয় এবং প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় তখন যাহাদের ইবাদত কবূল হইয়াছে তাহারা আনন্দিত হইবে ; আর যাহাদের ইবাদত কবূল হয় নাই তাহারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হইবে। অতএব কখনও হাস্য-কৌতুকে লিপ্ত হওয়াও উচিত নহে।

রোযার হাকীকত ঃ উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল, ব্যক্তি শুধু পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া রোযা রাখে তাহার রোযা প্রাণহীন দেহস্বরূপ। মানুষ নিজে ফেরেশতার ন্যায় করিয়া তুলিবে, ইহাই রোযার হাকীকত। ফেরেশতার খাহেশ (কাম, লোভ) নাই; চতুষ্পদ জন্তুর খাহেশ প্রবল। এইজন্যই পশু ফেরেশতা হইতে বহু দূরে এবং মানুষের মধ্যেও যাহাদের খাহেশ প্রবল তাহারা পশুর ন্যায়। খাহেশ দমন হইলেই ফেরেশতার সহিত মানুষের সাদৃশ্য স্থাপিত হয়। এইজন্যই মানুষ গুণের দিক দিয়া ফেরেশতার নিকটবর্তী নহে। ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী। অতএব ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত হইলে মানুষও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি ইফতারের পর উদর ভর্তি করিয়া আহার করে তাহার খাহেশ দুর্বল না হইয়া আরও প্রবল হইয়া উঠিবে এবং তাহার রোযা জীবন্ত হইবে না।

কাযা, কাফ্‌ফারা ইম্‌সাক ও ফিদ্‌ইয়া ঃ রমযানের রোযা ভঙ্গকারীর উপর অবস্থাভেদে কাযা, কাফ্‌ফারা, ইম্‌সাক ও ফিদ্‌ইয়া ওয়াজিব হইয়া থাকে। শরীয়ত অনুযায়ী যে ব্যক্তি রোযা রাখিতে বাধ্য সে কোন ওযরে বা বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভাঙ্গিলে ইহার পরিবর্তে তাহাকে উক্ত রোযার কাযা অবশ্যই করিতে হইবে। তদ্রূপ ঋতুবতী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক,মুসাফির, পীড়িত ব্যক্তি এবং ইসলাম-ত্যাগী

পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করিলে, তাহাদের সকলের উপরই রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু পাগল ও নাবালেগের প্রতি রোযার কাযা ওয়াযিব নহে।

কাফ্ফারা ঃ রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস বা ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিলে কিংবা বিনা ওযরে অন্য কোন উপায়ে রোযা ভঙ্গ করিলে তাহার উপর রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হইবে। কাফ্ফারা এই একজন দাস বা দাসী আযাদ করিতে হইবে। ইহা না পারিলে একাদিক্রমে ষাট দিন রোযা রাখিতে হইবে ইহাও না পারিলে ষাট জনের ফিতরা পরিমাণ শস্য ষাটজন মিসকিনকে দিতে হইবে।

ইম্সাক ঃ দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকা। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর ইম্সাক ওয়াযিব। ঋতুবতী স্ত্রীলোক দিবাভাগে পবিত্র হইলে, মুসাফির দিবাভাগে মুকীম হইলে অথবা পীড়িত ব্যক্তি দিবাভাগে আরোগ্য লাভ করিলে তাহাদের কাহারও উপর ইম্সাক ওয়াজিব নহে।

রমযান শরীফের প্রথম তারিখ সন্দেহযুক্ত হইলে কোন ব্যক্তি যদি খবর দেয় যে, আমি চাঁদ দেখিয়াছি, তবে যাহারা রোযা রাখে নাই তাহাদের উপর এই সংবাদ শ্রবণের পর সেই দিবসের অবশিষ্টাংশ পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম হইতে বিরত থাকিয়া রোযাদারের ন্যায় কাটাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। রোযাদার দিবাভাগে সফরে বাহির হইলে বা রোযা রাখিয়া সেই দিনই দূরবর্তী কোন স্থানে উপস্থিত হইলে রোযা ভঙ্গ করা তাহারও উচিত নহে। রোযা রাখিতে অক্ষম না হইলে মুসাফিরের পক্ষে রোযা না রাখা অপেক্ষা রাখাই উত্তম।

ফিদইয়া ঃ প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজনের ফিতরা পরিমাণ খাদ্য-শস্য মিসকিনকে দান করাই ফিদইয়া বলে। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কায় রোযা ভাঙ্গিলে ইহার কাযার সহিত (শাফেয়ী মতে) ফিদইয়া দেওয়াও ওয়াজিব হইবে। যে রোগী প্রাণনাশের ভয়ে রোযা ভঙ্গ করে তাহার ফিদইয়া দেওয়া ওয়াজিব নহে। অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম হইলে তাহার প্রতি কাযার পরিবর্তে ফিদইয়া ওয়াজিব হইবে। রমযানের রোযার কাযা আদায়ে বিলম্ব করিতে পরবর্তী রমযান আসিয়া পড়িলে (শাফেয়ী মতে) এই রোযার কাযার সহিত ফিদইয়াও ওয়াজিব হইবে।

বৎসরের অন্যান্য ফযীলতপূর্ণ রোযা ঃ বৎসরের মধ্যে ফযীলতপূর্ণ ও কল্যাণজনক দিনগুলিতে রোযা রাখা সুন্নত; যেমন আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন, মুহররম মাসের প্রথম দশ দিন এবং রজব ও শা'বান। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রমযানের পর মুহররমের রোযা সকল রোযা অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট ও পূর্ণ মুহররম মাসে রোযা রাখা সুন্নত এবং এই মাসের প্রথম দশ দিন রোযার জন্য খুব তাকীদ আছে। হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ আছে যে, মুহররম মাসের এক রোযা অন্যান্য মাসের বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং রমযান মাসের এক রোযা অন্যান্য মাসের বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং রমযানের শরীফের এক রোযা মুহররমের মাসে বিশ রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন–"যে ব্যক্তি পবিত্র মাসের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রোযা রাখিবে তাহাকে সাতশত বৎসর ইবাদতের সওয়াব প্রদান করা হইবে। পবিত্র মাস চারিটি, যথা– মুহররম, রজব, যিলকদ ও যিলহজ্ব এবং তন্মধ্যে যিলহজ্ব মাসের ফযীলত সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, ইহা হজ্জের মাস।" হাদীস শরীফে আছে, "আল্লাহ্র নিকট যিলহজ্বের প্রথম দশ দিনের ইবাদত অপেক্ষা অন্য কোন সময়ের ইবাদত অধিক উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় নহে। এই সময়ের একদিনের রোযা এক বৎসরের রোযার সমান এবং এক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের ন্যায়।" লোকে নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল! জিহাদেরও কি এত ফযীলত নাই?" তিনি বলিলেন–জিহাদেও নাই; তবে জিহাদে যাহার অশ্ব হত হয় এবং সে নিজেও শহীদ হয়, সে তত ফযীলত পাইবে।" রজব মাসে একাধারে রোযা রাখিলে ইহা রমযানের মাসের ন্যায় দেখায় বলিয়া কতিপয় সাহাবা (রা) তাহা অপছন্দ করিয়াছেন। এইজন্যই এই মাসে এক বা একাধিক দিন তাঁহারা রোযা রাখেন নাই।

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, শা'বানের অর্ধেক গত হইলে রমযান পর্যন্ত আর রোযা না রাখা উচিত। রমযান মাস যেন পৃথক দেখায় এইজন্য শা'বানের শেষার্ধে রোযা একেবারে না রাখাই উত্তম। রমযান শরীফের অভ্যর্থনার জন্য শাবানের শেষভাগে রোযা রাখা মাকরূহ। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে রাখিলে মাকরূহ নহে। আবার প্রত্যেক মাসের আয়্যামে বীয অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের রোযায় অত্যন্ত ফযীলত আছে। সপ্তাহে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখিলে সব রোযাই ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সারা বৎসরের মধ্যে পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম; যথা–ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন, আয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ, ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্বের তারিখের তিন দিন। ইফতার না করিয়া বরাবর রোযা রাখা মাকরূহ। যে ব্যক্তি সারা বৎসর রোযা রাখিতে অক্ষম, তাহার জন্য সারা বৎসর একদিন অন্তর রোযা রাখা ভাল। এইরূপ রোযাকে সওমে দাউদ বলে। কারণ, হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম এরূপ একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখিতেন। এই রোযার ফযীলত অনেক বেশি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট রোযার সর্বোৎকৃষ্ট

নিয়ম জানিতে চাহিলে তিনি উক্ত সাওমে দাউদের কথা বলিলেন। তিনি পুনরায় নিবেদন করিলেন–"আমি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম জানিতে চাহিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম আর নাই। আর ইহার অপর এক নিয়ম আছে, তাহা হইল বৃহস্পতিবারে ও সোমবারে রোযা রাখা।" ইহা পরিমাণে বৎসরের এক তৃতীয়াংশ বলিয়া ইহার ফযীলত প্রায় রমযানের সমতুল্য।

রোযার উদ্দেশ্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কামনা-বাসনা দমন করা ও অন্তর পবিত্র করাই রোযার উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় নিজ নিজ অন্তরকে যাচাই করিয়া দেখা প্রত্যেকেরই উচিত। তাহা হইলেও বুঝা যাইবে কোন্ অবস্থায় রোযা রাখা মঙ্গলজনক এবং কোন্ অবস্থায় রোযা না রাখা হিতকর। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও অনবরত এমনভাবে রোযা রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত, তিনি কখনও রোযা ভঙ্গ করেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি এমনভাবে রোযা বন্ধ রাখিতেন যে, লোকে মনে করিত, তিনি আর কখনও রোযা রাখিবেন না। তাঁহার রোযা রাখার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

অনেক দিন রোযা বন্ধ রাখার দোষ ঃ কতিপয় আলিম একাধারে চারি দিনের অধিক রোযা হইতে বিরত থাকাকে মাকরূহ বলিয়া মনে করেন। ঈদুল আযহার দিন এবং তৎপরবর্তী তিন দিন– এই চারিদিন রোযা রাখা হারাম, ইহা হইতেই তাঁহারা উক্তরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ, ক্রমাগত অনেক দিন রোযা না রাখিলে অলসতা ও হৃদয়ে মলিনতা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং অন্তদৃষ্টি দুর্বল হইয়া পড়িতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জ

হজ্জের ফযীলত ঃ হজ্জ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ এবং ইহা সারা জীবনে একবার করণীয় ইবাদত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি হজ্জ (ফরয হওয়া সত্ত্বেও ইহা) সম্পন্ন না করিয়া মারা যায়, তাহাকে বলিয়া দাও, সে ইয়াহুদী হইয়া মরুক বা খ্রিস্টান হইয়া মরুক।" তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার সময় পাপ করে না এবং বেহুদা ও অশ্লীল কথা বলে না সে পূর্বকৃত পাপ হইতে এরূপ নিষ্পাপ হইয়া যায় যেরূপ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন সে নিষ্পাপ ছিল। তিনি বলেন– "বহু পাপ এমন আছে যাহা আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান না হইলে খণ্ডন হয় না।" তিনি বলেন–"আরাফার দিনে শয়তান যেমন অপদস্থ ও বিষণ্ন হয় তদ্রূপ আর কোনদিন হয় না। কারণ, সেই দিন আল্লাহ্ স্বীয় বান্দার উপর বিশেষ রহমত নাযিল করেন এবং অসংখ্য কবীরা গুনাহ্ মাফ করিয়া থাকেন।" তিনি বলেন–যে ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আমলনামায় প্রতি বৎসর এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ বা মদীনা শরীফ পৌঁছিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে সে কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশ হইতে অব্যাহতি পাইবে।" তিনি বলেন–"বিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন মকবুল এক হজ্জ সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম ; বেহেশত ব্যতীত অন্য কিছুই ইহার বিনিময় হইতে পারে না।" তিনি আরও বলেন–"হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দান দণ্ডায়মান হইয়া যদি কেহ মনে করে যে, আমার গুনাহ মাফ হইল না, তবে তদপেক্ষা অধিক গুনাহ্ আর কিছুই নাই।" হযরত আলী বিন মওয়াফ্ফির নামে এক বুযর্গ ছিলেন। তিনি বলেন–"এক বৎসর আমি হজ্জ করত আরাফার রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, সবুজ পোশাকধারী দুই ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করেন। তাঁহাদের একজন অপরজনকে বলিলেন, 'আপনি কি জানেন এ বৎসর কতজন লোক হজ্জ করিয়াছে?' তিনি উত্তর করিলেন, 'না'। সেই ফেরেশতা বলিলেন, 'ছয় লক্ষ।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন– 'আপনি কি জানেন কত লোকের হজ্জ কবূল হইয়াছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'না'। সেই ফেরেশতা পুনরায় বলিলেন, 'মোট ছয়জনের হজ্জ কবূল হইয়াছে।' সেই বুযর্গ

বলিলেন–'ফেরেশতা দুইজনের কথা শুনিয়া ভয়ে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। আর আমি মনে মনে বলিলাম, আমি কখনই সেই ছয়জনের মধ্যে হইব না। এইরূপ চিন্তা ও মনস্তাপে মশ্‌আরুল হারামে পৌঁছিয়া আবার নিদ্রামগ্ন হইলাম। স্বপ্নে আবার ঐ দুই ফেরেশতাকে পরস্পর ঐ প্রকার আলাপ করিতে দেখিলাম। তখন একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'আপনি কি জানেন, আজ রাত্রে আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণের সম্বন্ধে কি আদেশ দান করিয়াছেন?' দ্বিতীয়জন বলিলেন– 'না'। সেই ফেরেশতা বলিলেন–'সেই ছয়জনের তুফায়েলে আল্লাহ্ ছয় লক্ষকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।' তৎপর প্রফুল্লচিত্তে আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলাম এবং করুণাময় আল্লাহ্‌র শোকরগুজারী করিলাম।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ ওয়াদা করিয়াছেন, প্রতি বৎসর হজ্জ উপলক্ষে ছয় লক্ষ লোক কা'বা শরীফ যিয়ারত করিবে। তদপেক্ষা কম লোকের সমাগম হইলে ফেরেশতা পাঠাইয়া তিনি এই সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিবেন। আর হাশরের দিন কাবা শরীফকে নববধূর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া উপস্থিত করা হইবে এবং হাজিগণ ইহার চারিদিকে তওয়াফ করিতে থাকিবে ও আহারা ইহার আচ্ছাদন বস্ত্রে স্পর্শ করিতে থাকিবে। পরিশেষে কা'বা শরীফ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং হাজিগণও উহার সহিত বেহেশতে ঢুকিয়া পড়িবে।

হজ্জের শর্তসমূহ ঃ নির্ধারিত সময়ে হজ্জ করিলে হজ্জ দুরস্ত হইবে। পহেলা শাওয়াল হইতে ৯ই যিলহজ্ব সময়। (এই সময়ে হজ্জের আনুষঙ্গিক কার্য করা যায় বলিয়া হজ্জের সময় বলা হইয়াছে)। ঈদুল ফিতরের দিন প্রাতঃকাল হইতেই হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা জায়েয। ইহার পূর্বে ইহরাম বাঁধিলে হজ্জ হইবে না, বরং ওমরাহ হইবে। ভালমন্দ বুঝিতে পারে এমন বালকের হজ্জ দুরস্ত হইবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু হইলে অভিভাবক যদি তাহার পক্ষে ইহরাম বাঁধিয়া শিশুকে আরাফার "ময়দানে উপস্থিত রাখিয়া সাঈ ও তওয়াফ" করে তবে এই হজ্জ শিশুর পক্ষেই গণ্য হইবে। অতএব নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়াই হজ্জের শর্ত। কিন্তু ইসলামের হজ্জের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ এবং ফরয আদায় হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে, যথা– (১) মুসলমান হওয়া, (২) আযাদ হওয়া, (৩) বালেগ হওয়া, (৪) বোধসম্পন্ন হওয়া, (৫) নির্দিষ্ট সময়ে ইহরাম বাঁধা। নাবালেগ অথবা দাস-দাসী যদি ইহরাম বাঁধে এবং আরাফাতের ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বে বালেগ হয় বা স্বাধীনতা লাভ করে তবে তাহারা হজ্জের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। ফরয ওমরাহ আদায়ের জন্যও উল্লিখিত পাঁচটি শর্ত রহিয়াছে। কিন্তু ওমরাহ সারা বৎসরই করা যায়।

অন্যের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্বরূপ হজ্জ করিবার শর্ত এই যে, প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করিয়া লইতে হইবে। নিজের ফরয হজ্জ আদায়ের পূর্বে অপরের

বদলী হজ্জ করিবার নিয়ত করিলে হজ্জকারীর হজ্জই আদায় হইবে ; যাহার বদলী হজ্জ করিবার নিয়ত করিয়াছে তাহার হজ্জ আদায় হইবে না। প্রথমে ফরয হজ্জ তৎপর কাযা হজ্জ, তৎপর মান্নতের হজ্জ এবং তৎপর অপরের পক্ষ হইতে বদলী হজ্জ করিতে হইবে। এই নিয়মের বিপরীত নিয়ম করিলেও এই তরতীব অনুযায়ী হজ্জ আদায় হইবে।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত এই–(১) মুসলমান হওয়া, (২) বালেগ হওয়া, (৩) আযাদ হওয়া ও (৪) সামর্থ্য থাকা। এই সামর্থ্য দুই প্রকার–(ক) সুস্থ দেহে শরীর খাটাইয়া স্বয়ং হজ্জ করিবার শক্তি থাকা। এই শক্তি আবার তিন জিনিসে লাভ হয়– (১) সুস্থ শরীর, (২) নিরাপদ রাস্তা অর্থাৎ পথিমধ্যে ভয়সঙ্কুল সমুদ্র এবং শত্রু কর্তৃক জান ও মাল নাশের আশংকা না থাকা এবং (৩) এই পরিমাণ ধন থাকা যদ্দারা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করত যাতায়াতের যানবাহন ও থাকা খাওয়ার ব্যয় স্বাচ্ছন্দ্যে চলে এবং তদুপরি সফর হইতে দেশে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবারস্থ সকলের ভরণ-পোষণ স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বাহ হয় ঃ (খ) যে ব্যক্তি নিজের শরীর খাটাইয়া হজ্জ করিতে পারে না– যেমন শরীর অবশ হইয়া পড়িল বা পীড়াগ্রস্ত হইয়া এমনভাবে শয্যাশায়ী হইল যে, পুনরায় আরোগ্য লাভের আশা নাই তাহার সামর্থ্য এই– তাহার এই পরিমাণ ধন থাকা আবশ্যক যাহাতে সে অন্য একজনকে যাবতীয় খরচ ও মজুরি দিয়া তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠাইয়া তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করাইতে পারে। অচল ব্যক্তির পুত্র পিতা হইতে কোন খরচ গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে পিতার হজ্জ করিয়া দিতে চাহিলে ইহাতে সম্মতি হওয়া পিতার কর্তব্য। কারণ, পিতার খেদমত করা মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। কিন্তু পুত্র নিজে হজ্জে না যাইয়া যদি বলে, আমি যাবতীয় খরচ ও মজুরি দিতেছি, আপনি অপর কাহাকেও প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করত আপনার হজ্জ করাইয়া লউন তবে এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া পিতার অবশ্য কর্তব্য নহে। কারণ ইহাতে ইবাদত-কার্যে পুত্রের অনুকম্পা গ্রহণ করা হয়। এইরূপ কোন অনাত্মীয় যদি অচল ব্যক্তি হইতে খরচাদি গ্রহণ না করিয়া প্রতিনিধিরূপে তাহার হজ্জ করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে এইরূপ অনুকম্পা গ্রহণ করাও আবশ্যক নহে।

হজ্জ সম্পাদনের সামর্থ্য হওয়ামাত্র অবিলম্বে হজ্জ সম্পাদন করা উচিত। বিলম্ব করাও দুরস্ত আছে। পরবর্তী কোন বৎসরে হজ্জ করিয়া থাকিলে তো মঙ্গল ; কিন্তু বিলম্ব করিতে করিতে হজ্জ করিবার পূর্বেই মৃত্যু হইলে গুনাহ্‌গার হইয়া মরিতে হইবে। কেহ ফরয হজ্জ আদায় না করিয়া মরিলে মৃত ওসিয়ত করুক বা না করুক তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করত হজ্জ করাইয়া লওয়া তাহার উত্তরাধিকারিগণের কর্তব্য। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির ঋণস্বরূপ। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন– "যে শহরের অধিবাসী হজ্জের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না

করে, আমার ইচ্ছা হয় যে তাহাদের নিকট হইতে জিযিয়া আদায় করিবার জন্য আমার অধীনস্ত শাসনকর্তাদিগকে আদেশ দেই।" (নিজেদের জানমাল রক্ষার্থে অমুসলমান প্রজাবৃন্দ মুসলিম রাষ্ট্রকে যে কর প্রদান করে তাহাকে জিযিয়া বলে)।

হজ্জের অবশ্য করণীয় কার্যাবলী ঃ হজ্জের অবশ্য করণীয় কার্য পাঁচটি ; যথা–(১) ইহ্‌রাম বাঁধা, (২) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা, (৩) সাঈ অর্থাৎ সাফা হইতে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত নির্ধারিত নিয়মে দৌড়ান, (৪) আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান হওয়া এবং (৫) অপর এক রেওয়ায়েত মতে মস্তক মুণ্ডন করা। (হানাফী মতে মস্তক মুণ্ডন অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে)। হজ্জের ওয়াজিব কার্য ছয়টি। তন্মধ্যে যে কোন একটি ত্যাগ করিলে হজ্জ বিনষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ছাগ কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। ওয়াজিবগুলি এই–(১) মীকাত অর্থাৎ নির্ধারিত স্থানে ইহরাম বাঁধা ; ইহরাম না বাঁধিয়া মীকাত অতিক্রম করিলে ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে। (২) মিনায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা। (৩) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। (৪) মুযদালফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা। (৫) এইরূপে মিনায় অবস্থান করা, (৬) বিদায়কালে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা। কাহারও মতে শেষোক্ত চারিটি কার্য পরিত্যাগ করিলে ছাগল কুরবানী ওয়াজিব না হইয়া সুন্নাত হইবে।

হজ্জ করিবার প্রণালী ঃ তিন প্রণালীতে হজ্জ করা যায় ; যথা– (১) ইফরাদ (২) কিরান ও (৩) তামাত্তো।

ইফরাদ হজ্জ ঃ ইহা সর্বোৎকৃষ্ট হজ্জ। ইহাতে প্রথমে শুধু হজ্জ করিতে হয়। হজ্জ সম্পন্ন করার পর কা'বা শরীফের বাহিরে যাইয়া ওমরাহ করিবার জন্য ইহরাম বাঁধিতে হয় এবং ওমরাহ্ সমাধা করিতে হয়। জি'রানায় ওমরাহের ইহ্‌রাম বাঁধা তান্‌ঈমে বাঁধা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আবার তানঈমে বাঁধা হুদাইবিয়াতে বাঁধা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; এই তিন স্থান হইতে ওমরাহের জন্য ইহরাম বাঁধা সুন্নত।

কিরান হজ্জ ঃ হজ্জ ও ওমরাহের ইহরাম একসঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিলে ইহাকে কিরান হজ্জ বলে। কিরানের নিয়ত এইরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَّ عُمْرَةٍ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমি হজ্জ ও ওমরাহের জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি।" ইহাতে উভয় কার্যের ইহরামই একত্রে হওয়া যায়। এইরূপ নিয়ত করিয়া হজ্জের আবশ্যক কর্মসমূহ সম্পন্ন করিলে তৎসঙ্গে ওমরাহও সম্পন্ন হইয়া যাইবে, যেমন যথারীতি গোসল করিলে ওযূও সম্পন্ন হইয়া যায়। যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরাহের নিয়ত এক সঙ্গে করত কিরান হজ্জ সমাধা করিবে তাহার প্রতি একটি ছাগল কুরবানী

করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মক্কা শরীফের অধিবাসিগণের উপর ওয়াজিব হইবে না। কারণ, দূরবর্তী মীকাতে ইহরাম বাঁধা তাঁহাদের উপর ওয়াজিব নহে, মক্কা শরীফও তাঁহাদের ইহরাম বাঁধার স্থান। কিরান হজ্জের অভিলাষী ব্যক্তি আরাফার ময়দানে অবস্থানের পূর্বে কা'বা শরীফ তওয়াফ ও সাঈ করিলে তৎসমুদয় কার্য হজ্জ ও ওমরাহ উভয়ের মধ্যেই গণ্য হইবে। কিন্তু আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর পুনরায় তওয়াফ করা আবশ্যক। কারণ, তওয়াফ আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর করিতে হয়।

তামাত্তো হজ্জ ঃ ইহার নিয়ম এই যে, প্রথমে ওমরাহের নিয়তে মীকাতে ইহরাম বাঁধিয়া মক্কা শরীফে গমনপূর্বক তওয়াফ প্রভৃতি সম্পন্ন করত ইহরাম ভঙ্গ করিবে। তৎপর হজ্জের সময়ে মক্কা শরীফে ইহ্‌রাম বাঁধিয়া যথানিয়মে হজ্জ সমাধা করিবে। তামাত্তো হজ্জকারীর উপর একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। কুরবানী করিতে অক্ষম হইলে ঈদুল আযহার পূর্বে উপর্যুপরি অথবা পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রোযা করিবে এবং নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আরও সাতটি রোযা করিবে। কিরান হজ্জকারীও কুরবানী করিতে অক্ষম হইলে এই নিয়মে দশটি রোযা করিবে। তামাত্তো হজ্জকারী যদি শাওয়াল, যিলকদ বা যিলহজ্বের প্রথম দশ তারিখের মধ্যে কেবল ওমরাহের নিয়তে ইহরাম বাঁধে কিংবা অন্য কোন প্রকারে হজ্জের মর্যাদা লাঘব করে ও হজ্জের ইহরাম নিজের নির্দিষ্ট মীকাতে না বাঁধিয়া থাকে, তবেই তাহার প্রতি কুরবানী ওয়াজিব হইবে। কিন্তু মক্কা শরীফের অধিবাসী বা মুসাফির হজ্জের সময় মীকাতে বা ইহার সমদূরবর্তী স্থানে গমন করত ইহরাম বাঁধিয়া আসিলে তাঁহার উপর ছাগ-কুরবানী ওয়াজিব হইবে না।

হজ্জের সময় হারাম কার্যসমূহ ও উহার কাফ্‌ফারা ঃ হজ্জের সময় ছয়টি কার্য হারাম ; যথা– (১) সেলাই করা পোশাকী বস্ত্র পরিধান করা। কারণ, ইহারামের অবস্থায় পিরহান, ইযার ও পাগড়ী পরিধান করা নিষেধ। বরং সেলাইবিহীন তহবন্দ, চাদর ও পাদুকা ব্যবহার করিতে হইবে। পাদুকা না থাকিলে নগ্নপদে থাকাও দুরস্ত আছে। তহবন্দ না পাইলে ইযারও পরিধান করা যাইতে পারে। ইহরামের অবস্থায় সপ্ত অঙ্গ আবৃত রাখা আবশ্যক। কিন্তু মাথা খোলা রাখিতে হইবে। স্ত্রীলোক আপন অভ্যাসমত কাপড় পরিধান করিবে; কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখিতে হইবে। উটের পিঠের হাওদায় বা চাঁদোয়ার মধ্যে থাকা দুরস্ত আছে। (২) সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা। সুগন্ধি দ্রব্য এবং সেলাই করা পোশাকী বস্ত্র ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করিলে ইহার কাফ্‌ফারাস্বরূপ একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। (৩) চুল নখ কর্তন করা। ইহরাম অবস্থায় চুল-নখ কাটিলে একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব। হাম্মামে গোসল করা, দূষিত রক্ত বাহির করা এবং সিঙ্গা লাগাইবার অনুমতি আছে। চুল উঠিয়া না যায়, এরূপভাবে চিরুনী করা দুরস্ত আছে। (৪) স্ত্রী-সহবাস করা। সহবাস করিলে

ইহার কাফ্ফারাস্বরূপ একটি উট বা একটি গরু কিংবা সাতটি ছাগ কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ নষ্ট হইয়া যাইবে ও পুনরায় হজ্জ করিয়া ইহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব হইবে। প্রথম ইহরাম ভঙ্গের পর সহবাস করিলে একটি উট কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে এবং হজ্জ নষ্ট হইবে না। (৫) ইহরাম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন, চুম্বন, রসালাপ প্রভৃতি করাও নাজায়েয। এরূপ কার্যে মযি বা মণি নির্গত হইয়া অপবিত্র হইলে একটি ছাগল কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করাও দুরস্ত নহে। করিলে এই বিবাহ শুদ্ধ হইবে না। এইজন্য ইহাতে ছাগ ইত্যাদি কুরবানী করাও ওয়াজিব নহে। (৬) ইহরাম অবস্থায় শিকার করাও দুরুস্ত নহে। কিন্তু সামুদ্রিক শিকার দুরস্ত আছে। স্থলজন্তু শিকার করিলে, উট, গরু ও ছাগল, এই তিন প্রকারের যে জন্তুর সহিত শিকার করা জন্তুর মিল আছে তাহা কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে।

হজ্জ করিবার নিয়ম

হজ্জের কর্তব্য-কার্যসমূহ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জানিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুন্নত তরীকা অনুযায়ী ইবাদতের ফরয, সুন্নত ও আদব-কায়দা পরস্পর জড়িতভাবে জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, অভ্যাস দ্বারা যে ব্যক্তি ইবাদত কার্য সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে তাহার নিকট সম্পাদনের হিসাবে সমস্ত ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব একরূপই হইয়া দাঁড়ায় এবং সুন্নত ও নফল কার্য দ্বারাই লোকে আল্লাহ্র মহব্বতের উন্নত মর্যাদা লাভে সমর্থ হয় ; যেমন রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, "ফরয কার্য সম্পন্ন করিয়া বান্দা আমার অতি নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু আমার প্রিয় বান্দাগণ কেবল আমার নৈকট্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, বরং সুন্নত ও নফল কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহারা এমন মরতবায় উপনীত হয় যে, তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় ও হস্ত পদ আমি হইয়া যাই। তখন তাহারা আমার মাধ্যমেই শ্রবণ করে, আমার মাধ্যমেই দর্শন করে, আমার মাধ্যমেই গ্রহণ করে, আমার মাধ্যমেই কথা বলে।" অতএব ইবাদতের সুন্নত ও নফলসমূহও প্রতিপালন করা আবশ্যক। প্রত্যেক ইবাদতেরই শরীয়ত নির্দেশিত রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

সফরের সামান ও পথে পালনীয় নিয়ম ঃ হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইবার পূর্বে তওবা করিয়া লইবে। কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকিলে ইহা পূরণ করিয়া দিবে। ঋণ থাকিলে পরিশোধ করিবে। নিজ পরিবারে স্ত্রী-পুত্রাদি যে সকল পোষ্য আছে তাহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও অর্থ দিয়া দিবে। অসিয়তনামা

লিখিবে। হালাল মাল হইতে পাথেয় লইবে। সন্দেহজনক মাল লইবে না। কারণ, সন্দেহজনক মাল দ্বারা হজ্জ করিলে হজ্জ কবূল না হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই পরিমাণ মাল সঙ্গে লইবে যাহাতে পথে ফকির-মিসকিনদিগকে কিছু কিছু দান করিতে পার। গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পূর্বে পথের শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে কিছু দান-খয়রাত করিবে। বাহনের জন্য সবল দ্রুতগামী পশু ভাড়া করিবে। যাবতীয় মালপত্র বাহনের পশুর মালিককে দেখাইয়া ভাড়া ঠিক করিবে যেন সে পরে অসন্তুষ্ট না হয়। অভিজ্ঞ নেককার সঙ্গী খুঁজিয়া লইবে যেন ধর্মকার্যে ও রাস্তার সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানে সহায়তা করিতে পারেন। যাত্রাকালে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং স্বীয় মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের নিকট দু'আ চাহিবে। তাহাদের জন্যও এইরূপ দু'আ করিবে–

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ ـ

অর্থাৎ "তোমার ধর্ম, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও তোমার কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিতেছি।" ইহার উত্তরে হজ্জযাত্রীর জন্য তাহারা এইরূপ দু'আ করিবে।

فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَ كَنَفِهٖ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَ جَنَّبَكَ الرَّدٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্, তোমাকে স্বীয় হিফাযত ও করুণায় রাখুন। পরহিযগারীকে আল্লাহ্ তোমার পথের সম্বল করুন। তিনি তোমাকে যাবতীয় ক্ষতি হইতে দূরে রাখুন, তোমার গুনাহ্ মাফ করুন এবং তুমি যে দিকেই মুখ ফিরাও না কেন, একমাত্র মঙ্গলের দিকেই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।"

গৃহ হইতে বাহির হওয়ার সময় দুই রাকআত নফর নামায পড়িবে–সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস নামায শেষে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ صَاحِبُ فِى السَّفْرِ وَ اَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ اِحْفَظْنَا وَاِيَّاهُمْ مِّنْ كُلِّ اٰفَةٍ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ مَسِيْرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই সফরে তুমিই আমার সাথী এবং আমার পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পত্তিতে তুমিই প্রতিনিধি। আমাদিগকে ও তাহাদিগকে সকল বিপদাপদ হইতে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্ এই সফরে আমরা তোমার নিকট নেকী, পরহিযগারী ও তোমার পছন্দনীয় আমল প্রার্থনা করি।" তৎপর গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بِكَ اِنْتَشَرْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ وَاِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِىْ التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَجِّهْنِىْ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিলাম। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত গুনাহ্ হইতে বিরত থাকার ও নেক কার্য করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। হে আল্লাহ্ তোমার নামে বাহির হইলাম এবং তোমার উপরই নির্ভর করিলাম, তোমাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করিলাম এবং তোমার দিকেই মুখ করিলাম। হে আল্লাহ্ পরহিযগারীকে আমার পথের সম্বল করিয়া দাও, আমার গুনাহ মাফ কর এবং আমি যে দিকেই মুখ ফিরাই একমাত্র মঙ্গলের দিকেই আমার মুখ ফিরাইয়া দাও।"

যানবাহনের উপর আরোহণকালে এই দো'আ পড়িবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র সহিত আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি ইহাকে (অর্থাৎ যানবাহনকে) আমাদের বশীভূত করিয়াছেন এবং আমরা ইহার আহার প্রদানকারী নহি। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" সফরকালে সমস্ত রাস্তায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল থাকিবে এবং উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, সর্বোচ্চ মর্যাদা একমাত্র তোমারই এবং সর্বাবস্থায় তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।" রাস্তায় কোন প্রকার ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে পূর্ণ আয়াতুল কুরসী, এই আয়াত–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

এবং সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িবে।

ইহরাম বাঁধা ও মক্কাশরীফে প্রবেশের নিয়ম

মীকাতে অর্থাৎ ইহরাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া হজ্জযাত্রিগণ ইহরাম বাঁধিবে। ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে গোসল করিবে এবং শুক্রবারের ন্যায় চুল, নখ ইত্যাদি কাটিবে। সেলাই করা পোশাক খুলিয়া রাখিয়া সাদা চাদর ও তহবন্দ পরিধান করিবে। আর ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধ দ্রব্য লাগাইয়া লইবে এবং রওয়ানা হইবার সময় উটকে দাঁড় করাইয়া মক্কাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া হজ্জের নিয়ত করিবে ও মনে-মুখে বলিবে–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ -

অর্থাৎ "আমি উপস্থিত হইয়াছি, হে আল্লাহ্ আমি উপস্থিত হইয়াছি। তোমার কোনই শরীক নাই। আমি তোমারই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা এবং নিয়ামত তোমারই এবং সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র তোমারই ; তোমার কোনই শরীক নাই।" যখনই কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে বা নিম্ন স্থানে অবতরণ করিবে অথবা বহু সংখ্যক হাজীর সহিত একত্র হইবে তখনই এই দু'আ উচ্চস্বরে পড়িবে।

কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হইলে গোসল করিবে। হজ্জের মধ্যে নয় স্থানে গোসল করা সুন্নত ; যথা–(১) ইহরাম বাঁধার সময়, (২) মক্কা শরীফে প্রবেশের সময়, (৩) কা'বাগৃহ তওয়াফ করিবার পূর্বে (৪) আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে, (৫) 'মুযদালাফায়' অবস্থানকালে এবং (৬, ৭, ৮) তিনবার কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনবার গোসল এবং (৯) বিদায়কালীন তওয়াফের পূর্বে। কিন্তু জমরা-আকাবা নামক স্থানে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য গোসল করিতে হয় না। মোটকথা, গোসল করিয়া মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে এবং শহরে প্রবেশ করত কা'বাগৃহের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ামাত্র এই দু'আ পড়িবে–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ وَ دَارَكَ دَارُ السَّلاَمِ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ - اَللّٰهُمَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهٗ وَشَرَّفْتَهٗ

وَ كَرَّمْتَهٗ اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَّزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَّ تَكْرِيْمًا وَّزِدْهُ مَهَابَةً وَّ زِدْ مَنْ حَجَّهُ بِرًّا وَّ كَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْلِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَدْخِلْنِيْ جَنَّتَكَ وَ اَعِذْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি এবং তোমা হইতেই সমস্ত শান্তি ও তোমার গৃহই শান্তিময় গৃহ। তুমি মঙ্গলময়, হে প্রতাপশালী ও মহান। হে আল্লাহ্, ইহা তোমার গৃহ। ইহাকে তুমি মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান দান করিয়াছ। হে আল্লাহ্, ইহার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান আরও বৃদ্ধি কর যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্জ করিয়াছে তাহার পুণ্য ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ্, আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দাও, আমাকে তোমার বেহেশতে প্রবেশ করাও এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রদান কর।" তৎপর বনি শাইবা নামক দ্বার দিয়া বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করিবে এবং হাজরুল আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হইয়া ইহাকে চুম্বন করিবে। লোকের ভীড়ের দরুন চুম্বন অসম্ভব হইলে ইহার দিকে হস্ত প্রসারণপূর্বক বলিবে–

اَللّٰهُمَّ اَمَانَتِيْ اَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِيْ تَاهَدْتُّهٗ اَشْهَدْلِيْ بِالْمُوَافَاتِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমার আমানত আমি আদায় করিলাম এবং আমার প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিলাম। আমার জন্য সাক্ষী থাক যে, আমি সম্পূর্ণ করিলাম।" ইহার পর কা'বাগৃহ তওয়াফ করিবে।

তওয়াফের নিয়ম ঃ নামাযের ন্যায় কাবাগৃহ তওয়াফকালেও দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া এবং সতর ঢাকিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। তওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা দুরস্ত আছে। চাদর গায়ে দিবার সময় ডান বাহু সম্পূর্ণ বাহিরে রাখিয়া চাদরটি বিস্তারিতভাবে ডান বগলের নিম্ন হইতে উঠাইয়া পিঠ ও বুক ঢাকিয়া চাদরের উভয় পার্শ্ব বাম স্কন্ধের উপর রাখিবে। এইরূপে চাদর গায়ে দেওয়াকে 'যতেবাগ' বলে। কাবাগৃহকে বামে রাখিয়া হাজরে আস্ওয়াদের নিকট হইতে তওয়াফ শুরু করিবে। তওয়াফকালে কা'বাগৃহ হইতে কমপক্ষে তিন ধাপ দূরে থাকিয়া চলিতে হইবে। কারণ, তদপেক্ষা নিকট দিয়া দৌড়াইলে কা'বাগৃহের গিলাফ বা পর্দার উপর পা পড়িতে পারে। যতদূর পর্যন্ত গিলাফ বা পর্দা বিস্তৃত থাকে ততটুকু স্থানকে কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। তওয়াফ আরম্ভ করিবার সময় এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا وَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, এই তওয়াফ তোমার প্রতি ঈমানের প্রতীক-স্বরূপ এবং তোমার কিতাবের সত্যতার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন ও তোমার প্রতি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যে।" আর কাবাগৃহের দরজায় পৌছিলে এই দু'আ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَامُ حَرَمُكَ وَ هٰذَا الاَمْنُ اَمْنُكَ وَ هٰذَا مُقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, ইহা তোমার গৃহ। এই হরম তোমার হরম। এই নিরাপদ স্থান তোমার আশ্রয় ; ইহা দোযখের আগুন হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান।" তৎপর রুক্নে ইয়ামানীতে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, অবশ্যই আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি– সন্দেহ, শিরক, অবিশ্বাস, মুনাফেকী, শত্রুতা, কুস্বভাব এবং পরিবার, ধন ও সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি হইতে।" অতঃপর কা'বাগৃহের ছাদের পানি পড়িবার নালী বা পাইপের নিম্নে উপস্থিত হইলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ بِكَاْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لاَّ اَظْمَاءُ بَعْدَهٗ اَبَدًا ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, যেদিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না সেদিন তোমার আরশের ছায়ার নিচে আমাকে স্থান দিও। হে আল্লাহ্, আমাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানপত্র হইতে পানীয় পান করাইও যেন তৎপর কখনও পিপাসার্ত না হই।" আরও অগ্রসর হইয়া রুক্নে শামীতে পৌছিলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّ تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই হজ্জ কবূল কর, এই পরিশ্রম সফল কর। আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার এই তেজারত চিরস্থায়ী কর। হে প্রতাপান্বিত ও ক্ষমাশীল, ক্ষমা কর, দয়া কর। আর (আমার পাপ সম্বন্ধে) তুমি যাহা কিছু জান, তাহা ছাড়িয়া দাও (তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করিও না)। অবশ্যই তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক মহৎ।" তৎপর রুক্নে ইয়ামানীতে পৌছিয়া বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنَ الْفِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, আমি কুফর হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং অভাব, কবরের আযাব ও জীবন-মরণের বিপদাপদ হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর ইহ-পরকালের অপমান হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" এই রুক্ন হইতে হজরে আস্ওয়াদ পর্যন্ত যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وفِى الْاٰخِرَةِ وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রভূ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল আমাদিগকে দান কর। আর তোমার অনুগ্রহে কবরের আযাব ও দোযখের আযান হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

হাজরে আসওয়াদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপরোক্ত নিয়মে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার হাজরে আসওয়াদের নিকট উপস্থিত হইলে একবার তওয়াফ করা হইল। এই প্রকারে সাতবার তওয়াফ করিবে এবং প্রত্যেক বার তওয়াফকালে উল্লিখিত দু'আগুলি যথাস্থানে পড়িবে। প্রত্যেক প্রদক্ষিণকে 'শাওত' বলে। প্রথম তিন শাওত দ্রুতগতিতে খুবই উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতে হয়। কাবাগৃহের নিকট দিয়া লোকের ভিড় হইলে কিছু দূর দিয়া তওয়াফ করিবে যেন দ্রুতগতিতে চলিতে পার। শেষের চারি শাওতে আস্তে আস্তে চলিবে। প্রত্যেক তওয়াফে হাজরে আস্ওয়াদ চুম্বন করিবে এবং

রুক্নে ইয়ামানীর উপর হাত ফিরাইবে। লোকের ভিড়ের জন্য স্পর্শ করিতে না পারিলে হাতে ইশারা করিবে। এইরূপে সাতবার তওয়াফ শেষ হইলে কা'বাগৃহের দ্বার ও হাজরে আস্ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইবে। পেট, বুক ও ডান গণ্ডদেশ কা'বাগৃহের দেওয়ালের সহিত মিলাইয়া দুই হাতের তালু খোলাভাবে দেওয়ালে স্থাপনপূর্বক তন্মধ্যে মাথা রাখিবে অথবা কা'বা শরীফের চৌকাঠের উপর রাখিবে। এই স্থানটিকে মুল্তাযম বলে। এই স্থানে দু'আ কবূল হয়। এই স্থলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتَ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَاَعْذِنِىْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَّقَنِعْنِى بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ فِيْمَا اٰتَيْتَنِىْ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্, হে কা'বাগৃহের প্রভু, আমার কাঁধকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর এবং সকল মন্দ হইতে আমাকে আশ্রয় দাও। আর আমাকে তুমি যাহা কিছু দান করিয়াছ তাহাতে বরকত দাও।" এই সময় অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়িবে, কৃত পাপের ক্ষমা চাহিবে এবং মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করিবে। তৎপর 'মাকামে ইবরাহীম'-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই রাকআত নামায পড়িবে। ইহা 'তওয়াফের দুই রাকআত' নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্যন্ত করিলে তওয়াফ শেষ হইল। উক্ত দুই রাকআতের প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়িবে। নামাযের পর মুনাজাত করিবে। সাতবার প্রদক্ষিণ এবং এই দুই রাকআত নামায সম্পন্ন করত হাজরে আস্ওয়াদের নিকট যাইয়া উহাকে চুম্বন করিয়া তাওয়াফকার্য সমাপ্ত করিবে। অতঃপর সাঈ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ান কার্যে লিপ্ত হইবে।

সাঈর নিয়ম ঃ প্রথম সাফা পাহাড়ে যাইবে এবং এত উপরে আরোহণ করিবে যেন কা'বা শরীফ দেখা যায়। তথায় কা'বাগৃহের দিকে মুখ করিয়া এই দু'আ পড়িবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্, ব্যতীত কেহই উপাসনার যোগ্য নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। সমস্ত বিশ্বের আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই এবং তাঁহার জন্যই সকল

প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন ও প্রাণসংহার করেন ; অথচ তিনি চিরজীবী, কখনই মরিবেন না। তাঁহারই হস্তে সর্ববিধ মঙ্গল এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একক, তাঁহার অঙ্গীকার সত্য। তিনি তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করেন এবং তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে পরাক্রমশালী করেন। তিনি একাকী বহু বিরোধী সেনাদলকে ধ্বংস করিয়াছেন। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। বিশ্বাসিগণ অকপটতার সহিত তাঁহার বন্দেগী করিয়া থাকে যদিও কাফিরগণ ইহা পছন্দ করে না।" এতদ্ব্যতীত মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দু'আ করিবে। তৎপর সাফা পাহাড় হইতে অবতরণ করত মারওয়ার দিকে অগ্রসর হইবে। প্রথমে আস্তে আস্তে চলিবে এবং এই দু'আ পড়িবে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّ تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الاَعَزُّ الاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, ক্ষমা কর, দয়া কর এবং আমার যাহাকিছু পাপ তুমি জান তাহা ছাড়িয়া দাও। অবশ্যই তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা মহান। হে আল্লাহ্, হে আমাদের প্রভু, ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মঙ্গল আমাদিগকে দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা কর।" এই দু'আ পড়িতে পড়িতে মসজিদের পার্শ্বে সবুজ খুঁটি পর্যন্ত ধীরে ধীরে চলিবে। ইহা হইতে ছয় গজ সম্মুখের দিকে অনুরূপ আর একটি খুঁটি আছে। উভয় খুঁটির মধ্যবর্তী ছয় গজ ভূমি খুব তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবে। দ্বিতীয় খুঁটিটি অতিক্রম করত আস্তে আস্তে চলিয়া মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত যাইবে। মারওয়া পাহাড়ে আরোহণপূর্বক সাফা পাহাড়ের দিকে মুখ করিয়া সাফা পাহাড়ে যে দু'আ পড়া হইয়াছে, এখানেও তাহাই পড়িবে। এই নিয়মে সাফা হইতে মারওয়া পর্যন্ত গেলে একবার দৌড় হইল। আবার মারওয়া হইতে সাফা পৌঁছিলে আর একবার দৌড় হইল। এইরূপে সাতবার দৌড়াইবে। এই পর্যন্ত কার্যগুলি সমাপ্ত হইলে তওয়াফে কুদূম ও তওয়াফে সাঈ করিবে। হজ্জের মধ্যে এই তওয়াফ সুন্নত। হজ্জের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ নির্ধারিত তওয়াফ আরাফার ময়দানে অবস্থানের পর করিতে হয়। সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ের সময় ওযূ-গোসল দ্বারা শরীর পবিত্র করিয়া লওয়া ওয়াজিব। এ পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা সাঈর জন্য যথেষ্ট। কারণ আরাফার অবস্থানে পর সাঈ করিতে হইবে বলিয়া কোন শর্ত নাই। কিন্তু তওয়াফের পরে হওয়া আবশ্যক, যদিও এই তওয়াফ সুন্নত হইয়া থাকে।

আরাফার ময়দানে অবস্থানের নিয়ম ঃ আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্ব তারিখে হজ্জ যাত্রী কাফেলা আরাফার ময়দানে পৌঁছিলে তওয়াফে কুদূম (প্রাথমিক তওয়াফ) করিবে না ; আরাফার দিনের পূর্বে পৌঁছলে তওয়াফে কুদূম করিবে। যিলহজ্জের ৮ই তারিখে মক্কা শরীফ হইতে বাহির হইয়া মিনাবাজারে রাত্রিযাপন করিবে ; পরদিন আরাফার ময়দানে পৌঁছিবে। ৯ই যিলহজ্জ তারিখ দ্বিপ্রহর হইতে পরদিবস সুবহে সাদিক হওয়ার পর কেহ আরাফার ময়দানে অবস্থানের সময়; সুতরাং ১০ই যিলহজ্ব সুবহে সাদিক হওয়ার পর কেহ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হইলে তাহার হজ্জ হইবে না। আরাফার দিন গোসল করিবে এবং যোহরের নামায আসরের নামাযের সহিত পড়িবে। নামাযের পর দু'আয় লিপ্ত থাকিবে। শারীরিক শক্তি বজায় রাখিয়া। নিজকে অধিক দু'আ ও প্রার্থনা কার্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য আরাফার দিনে হাজীদের রোযা রাখা উচিত নহে। এই শুভ ও পুণ্যময় দিবসে আল্লাহ্র সহিত মন ও প্রাণের অটল ও একাগ্র যোগাযোগ রক্ষা করাই হজ্জের আসল উদ্দেশ্য এবং ইহা দু'আ কবূল হওয়ার দিবস। এই দিবসের সর্বোত্তম যিকির হইল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এই দিন দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্র নিকট অনুনয়-বিনয় বিলাপ ইস্তেগফার, তওবা এবং অতীত পাপের ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া অতিবাহিত করা উচিত। আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে পাঠ করিবার অনেক দু'আ আছে। এই সমস্ত লিখিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। এই দু'আসমূহ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুম' কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তথা হইতে মুখস্থ করিয়া লওয়া উচিত। যে দু'আ মুখস্থ করিবে তাহাই সেই সময় পড়িবে ; কারণ হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়াই সেই সময় মঙ্গলজনক। মুখস্থ না থাকিলে দেখিয়া পড়িবে। অথবা অন্যের পাঠ শুনিয়া 'আমীন' বলিবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দানের সীমা ছাড়িয়া যাইবে না।

হজ্জের অবশিষ্ট কার্যের নিয়ম ঃ আরাফার ময়দানে অবস্থানে পর মুযদালাফায় গমন করিবে। সেখানে যাইয়া গোসল করিবে; কারণ মুযদালাফা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করত ইশার নামাযের সহিত মিলাইয়া এক আযান ও ইকামতে উভয় নামায আদায় করিবে। সম্ভব হইলে এই রাত্রি মুযদালাফায় জাগরিত থাকিয়া ইবাদতে কাটাইবে। কারণ ইহা অতিশয় ফযীলতের রাত্রি ; এই রাত্রে মুযদালাফায় অবস্থান করাই ইবাদতের মধ্যে গণ্য। মুযদালাফায় অবস্থান না করিলে একটি ছাগল কুরবানী করিতে হয়। মিনায় নিক্ষেপের জন্য এখান হইতে সত্তরটি প্রস্তরখণ্ড সঙ্গে লইবে। কারণ, এখানে প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। রাত্রির শেষভাগে মিনাবাজারে যাওয়ার আয়োজন করিবে। ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়িয়া রওয়ানা হইবে। মুযদালাফার শেষপ্রান্তে 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে পৌঁছিয়া রাত্রির অন্ধকার দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং দু'আ

করিতে থাকিবে। তৎপর তথা হইতে 'ওয়াদিউল মাহশার' নামক স্থানে পৌঁছিবে। এই স্থানটি অতি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় বাহন পশুকে খুব দ্রুত হাঁকাইয়া নিবে এবং পদাতিকগণও অতি দ্রুতগতিতে চলিবে। কারণ, এই ময়দান অতি দ্রুতগতিতে অতিক্রম করা সুন্নত। ঈদের দিন প্রাতঃকালে কখনও আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবর পূর্ণ তকবীর বলিবে, কখনও 'লাব্বাইকা' বলিবে। এইরূপ 'জামারাত' নামক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে (এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে)। তৎপর ইহা হইতে অবতরণ করত 'জামারাতুল আকাবা' নামক উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবে (এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে) তথা হইতে কা'বাগৃহের দিকে মুখ ফিরাইলে ডান হাতের দিকে রাস্তার অপর পারে এই স্থানটি অবস্থিত। সূর্য এক বল্লম পরিমাণ উপরে উঠিলে সাতটি প্রস্তর উক্ত জাম্‌রাতে নিক্ষেপ করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখা উত্তম। এখানে 'লাব্বাইক' না বলিয়া ইহার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবর' বলিবে। প্রত্যেকটি প্রস্তর নিক্ষেপকালে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

এই পর্যন্ত কার্য শেষ হইলে 'লাব্বাইকা' ও 'আল্লাহু আকবর' আর বলিতে হইবে না। কিন্তু আয়্যামে তাশরীকের শেষ দিবসের প্রাতঃকাল পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলিবে। ঈদের দিন হইতে চতুর্থ দিবস পর্যন্ত আয়্যামে তাশরীক। তৎপর (মিনাবাজারে) নিজ নিজ মঞ্জিলে প্রত্যাবর্তন করত দু'আ ও প্রার্থনায় লিপ্ত হইবে। কুরবানী করা আবশ্যক হইলে কুরবানী করিবে এবং কুরবানী শর্তগুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এ সময়ে মস্তকও মুণ্ডন করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপ হইতে মস্তক মুণ্ডন পর্যন্ত কার্য শেষ হইয়া গেলে এক তাহাল্লুল হইয়া গেল। ইহার পর স্ত্রী-সহবাস ও শিকার ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্য সকল কাজ হালাল হইয়া যাইবে।

তওয়াফে রুক্‌ন ঃ তৎপর মক্কা শরীফে যাইয়া তওয়াফে রুকন করিবে। ঈদের পূর্বরাত্রির অর্ধাংশ অতিবাহিত হইলেই তওয়াফে রুক্‌নের সময় আরম্ভ হয়। কিন্তু ঈদের দিন করাই উত্তম। তওয়াফ রুক্‌নের শেষ সময়ের কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই। যত বিলম্বেই এই তওয়াফ করা হউক না কেন, ইহা নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় তাহল্লুল হাসিল হইবে না এবং স্ত্রী-সহবাস ও শিকার হারাম থাকিয়া যাইবে। পূর্ব বর্ণিত তওয়াফে কুদূমের নিয়মে তওয়াফে রুক্‌ন শেষ করিলেই হজ্জ সমাপ্ত হইল। তখন হাজীগণের জন্য স্ত্রী-সহবাস এবং শিকারও দুরস্ত হইবে। ইতঃপূর্বে সাঈ করা হইয়া থাকিলে এখন আর করিতে হইবে না। অন্যথায় সাঈয়ে রুক্‌ন এই তওয়াফের পরে করিবে। প্রস্তর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন এবং কাবা শরীফের

তওয়াফ করিলে হজ্জ পূর্ণ হইল এবং ইহ্‌রামের বন্ধন মুক্ত হইল। ইহরাম মুক্ত হইলেও আয়্যামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত প্রস্তর নিক্ষেপ এবং মিনাবাজারে রাত্রিযাপন করিতে হয়। সুতরাং তওয়াফ ও সাঈ সমাধা করিয়া ঈদের দিনেই মিনাবাজারে ফিরিয়া আশা আবশ্যক। মিনায় রাত্রিবাস করিবে। ইহা ওয়াজিব।

ঈদের পরদিন নিক্ষেপের জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল করিবে। প্রথমে আরাফার নিকটবর্তী জামরায় যাইয়া কিবলামুখী হইয়া সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং সূরা বাকারার পরিমাণ দীর্ঘ দু'আ করিবে। তৎপর মধ্যবর্তী জামরায় সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং দু'আ করিবে। ইহার পর জামরায়ে আকাবায় সাতটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে এবং সেইদিন মিনাবাজারে রাত্রিবাস করিবে। ১২ই যিলহজ্ব তারিখেও উক্ত নিয়মে একুশটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে। ইচ্ছা করিলে এই পর্যন্ত কার্য শেষ করিয়াই মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিতে পার। কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত তথায় বিলম্ব করিলে সেই রাত্রেও মিনাবাজারে অবস্থান এবং পরবর্তী দিনে একুশটি প্রস্তর নিক্ষেপ করাও ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। হজ্জের বর্ণনা এ পর্যন্তই শেষ হইল।

ওমরার বিবরণ ঃ ওমরা করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে গোসল করত হজ্জের সময়ের ন্যায় ইহরামের বস্ত্র পরিধান করিবে এবং মক্কা শরীফ হইতে বাহির হইয়া ওমরার মীকাত অর্থাৎ জি'রানা, তানঈম ও হুদাইবিয়া– এই তিন স্থানের কোন এক স্থানে যাইবে। সে স্থানে ওমরার নিয়ত করিবে এবং لبيك بعمرة বলিবে। তৎপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মসজিদে গিয়া দুই রাকআত নামায পড়িবে এবং মক্কা শরীফে ফিরিয়া আসিবে। ফিরিবার পথে 'লাব্বাইকা' দু'আ পড়িতে থাকিবে। মসজিদে প্রবেশ করত লাব্বাইকা বলা স্থগিত রাখিবে এবং হজ্জের বিবরণে বর্ণিত নিয়মে তওয়াফ ও সাঈ করিবে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করিবে। এ পর্যন্ত বর্ণিত নিয়মে তওয়াফ ও সাঈ করিবে। অতঃপর মস্তক মুণ্ডন করিবে। এ পর্যন্ত কার্যগুলিই করিলেই ওমরা পূর্ণ হইল। সারা বৎসরই ওমরা করা চলে। মক্কাবাসীগণের যথাসাধ্য ওমরা করা উচিত। অক্ষম হইলে তওয়াফ করা উচিত। ইহাতেও অসমর্থ হইলে কা'বা শরীফ দর্শন করা আবশ্যক।

কা'বা শরীফে প্রবেশ ঃ কা'বা শরীফের দরজায় পৌঁছিয়া দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে নামায পড়িবে এবং খালি পায়ে খুব বিনয় ও নম্রতার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিবে।

যমযমের পানি পান ঃ যমযমের পানি পেট ভরিয়া পান করিবে। পানের সময় যে নিয়ত করিবে তাহাই পূর্ণ হইবে। যমযমের পানি পানকালে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ سُقْمٍ وَّارْزُقْنِىْ الْاِخْلَاصَ وَالْيَقِيْنَ وَالْعَافَاتِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, এই পানিকে আমার সকল রোগের আরোগ্য করিয়া দাও। এবং (ইহার বরকতে) আমাকে অকপটতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ইহ-পরকালের শান্তি ও মঙ্গল দান কর।"

বিদায়কালীন তওয়াফ ঃ নিজ গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইলে প্রথমে সকল আসবাবপত্র বাঁধিয়া লইবে এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে। তৎপর বাইতুল্লাহ্ হইতে বিদায় হইবে অর্থাৎ সাতবার তওয়াফ করিবে এবং দুই রাকআত নামায পড়িবে। এই তওয়াফে পূর্ববর্তী তওয়াফের ন্যায় ইযতেবাগ ও তাড়াতাড়ি করা আবশ্যক নহে। অতঃপর 'মূতানাম' নামক স্থানে যাইয়া দু'আ করিবে। অবশেষে কা'বাগৃহের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাতে হাঁটিতে হাঁটিতে হারম শরীফের সীমা অতিক্রম করিবে।

মদীনা শরীফ যিয়ারত ঃ মক্কা শরীফের কার্য শেষ করিয়া মদীনা শরীফ যাইবে, কারণ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি আমার (সমাধি) যিয়ারত করিবে, সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার দর্শন করিল।" তিনি আরও বলেন– "যে ব্যক্তি মদীনা শরীফ আগমন করে এবং আমার (রওযা) যিয়ারত ব্যতীত তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে আল্লাহ্র নিকট তাহার হক সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ আমাকে তাহার শাফাআতকারী করিবেন।" মদীনা শরীফের পথে অধিক সংখ্যায় দরূদ পড়িবে এবং মদীনার প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পড়িলে এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِيْ وِقَايَةً مِّنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْعَذَابِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ ইহা তোমার রসূলের হরম। সুতরাং ইহাকে আমার জন্য দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার স্থান এবং সর্বপ্রকার শাস্তি ও মন্দ হিসাব-নিকাশ হইতে নিরাপদে থাকার স্থান কর।" প্রথমে গোসল করত পাকপবিত্র সাদা পোষাক পরিধান করিবে এবং দেহে ও পরিধেয় বস্ত্রে সুগন্ধি লাগাইবে। তৎপর শহরে প্রবেশ করিবে। শহরে প্রবেশ করিয়া সর্বদীনতা ও নম্রতার সহিত অবস্থান করিবে এবং এই দু'আ পড়িবে–

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, আমাকে দাখিল কর সত্য দাখিল করা এবং আমাকে বাহির কর সত্য বাহির করা ও তোমার নিকট হইতে আমার জন্য প্রবল সাহায্য পাঠাও।" অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করত মিম্বরের নিচে দুই রাকআত নামায পড়িবে। এই নামায পড়িবার সময় এইরূপে দাঁড়াইবে যেন মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধের বরাবর থাকে। কারণ, ইহাই রাসূল মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাঁড়াইবার স্থান ছিল। নামাযান্তে রওযা মুবারক যিয়ারত মনোযোগ দিবে এবং সেদিকে মুখ ফিরাইবে। তখন কা'বা শরীফ পিছন দিকে থাকিবে। রওযা শরীফের প্রাচীরের উপর হাত স্পর্শ করিয়া চুম্বন করা সুন্নত নহে ; বরং দূরে থাকিলেই অধিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়। রওযা শরীফের দিকে মুখ করিয়া এই দু'আ পাঠ করিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ الطَّاهِرِيْنَ وَ اَزْوَاجِكَ اَلطَّاهِرَاتِ وَاُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَزٰى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَ صَلّٰى عَلَيْكَ كُلَّ مَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ وَ غَفَلَ عَنْكَ الْغَافِلُوْنَ -

অর্থাৎ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র নবী আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র প্রিয়তম, আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্র মনোনীত আপনার উপর সালাম। হে আদম সন্তানের একচ্ছত্র নেতা, আপনার উপর সালাম। হে নবীগণের সরদার, শেষ নবী ও বিশ্বপ্রভুর রাসূল, আপনার উপর সালাম ; আপনার সন্তানগণের উপর সালাম ; আপনার পবিত্র সাহাবীগণ এবং বিশ্ব মুসলমানের জননী আপনার পবিত্র পত্নিগণের উপর সালাম। আল্লাহ্ অন্য কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে যাহাকিছু পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন আমাদের পক্ষ হইতে তদপেক্ষা অধিক পুরস্কারে আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুন এবং যত স্মরণকারী আপনাকে স্মরণ করে ও যত গাফিল লোক আপনাকে ভুলিয়া রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা পরিমাণ রহমত আল্লাহ্ আপনার উপর বর্ষণ করুন।"

অপর কেহ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সালাম পৌঁছাইবার ওসিয়ত করিয়া থাকিলে এইরূপ বলিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ -

(فلان শব্দের স্থলে সেই ব্যক্তির নাম বলিবে)। তৎপর সামান্য অগ্রসর হইয়া হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুমার প্রতি এইরূপে সালাম দিবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ الْمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَّالْقَائِمَيْنِ بَعْدَهُ فِىْ اُمَّتِهِ بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ نَتَّبِعَانِ فِىْ ذَالِكَ اٰثَارَهُ تَعْمَلَانِ بِسُنَّتِهِ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ خَيْرَ مَازٰى وُزَرَاءَ نَبِىٍّ عَلٰى دِيْنِهِ -

অর্থাৎ "হে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযীরদ্বয়, তাঁহার জীবিতকালে ধর্মপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার উম্মতের মধ্যে ধর্ম-কর্মের প্রতিষ্ঠাকারীদ্বয় আপনাদের উপর সালাম ; আপনারা উভয়ে ধর্ম-কর্মে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী আমল করিতেন। সুতরাং আল্লাহ্ আপনাদিগকে যে কোন নবীর ধর্ম-উযীরকে প্রদত্ত পুরস্কার অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। তৎপর তথায় দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য দু'আ করিবে।

ইহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া 'জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গমন করত সাহাবী ও তৎকালীন বুযর্গগণের পবিত্র কবরসমূহ যিয়ারত করিবে।

মদীনা শরীফ হইতে ফিরিবার কালে আবার রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবাকর যিয়ারত করিয়া বিদায় হইবে।

হজ্জের নিগূঢ় তত্ত্ব ঃ হজ্জের কার্যাবলী সম্বন্ধে উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহা উহার বাহ্য আবরণমাত্র। ইহাদের প্রত্যেকটির এক একটি রহস্য ও গূঢ় তত্ত্ব রহিয়াছে। উপদেশ গ্রহণ ও পরকালের বিষয় স্মরণ করাই উহাদের মূল উদ্দেশ্য। বাস্তব কথা এই আল্লাহ্ মানুষকে এরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে তাহার সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করিয়া না দিলে পূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। ইহা দর্শন পরিচ্ছেদে বর্ণিত রহিয়াছে। আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির অনুসরণই মানুসের ধ্বংসের কারণ। প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুসারে চলিলে মানুষের কোন কর্মই শরীয়তানুযায়ী হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ ব্যক্তি প্রবৃত্তিরই

গোলাম, আল্লাহ্র বান্দা হইয়া তাঁহার বিধানমতে চলিলেই চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সৌভাগ্য লাভের কোন উপায় নাই। এইজন্য পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রতিই চির কৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনের নির্দেশ ছিল। এই কারণেই তখনকার ইবাদতকারীগণ মানুষের সংশ্রব পরিত্যাগ করত পর্বতগুহায় আশ্রয় লইতেন এবং কঠোর সাধনায় সারা জীবন কাটাইয়া দিতেন। লোকে রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাদের ধর্মে কি চির কৌমার্য ও সন্ন্যাসব্রত নাই?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"উহার পরিবর্তে আমাদের প্রতি জিহাদে ও হজ্জের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেন।" সুতরাং দেখা গেল, আল্লাহ্ এই উম্মতকে সন্ন্যাসব্রতের পরিবর্তে হজ্জের নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। কারণ, ইহাতে কঠোর সাধনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং আত্মা সংশোধনমূলক উপদেশও পাওয়া যায়। কেননা আল্লাহ্ কা'বা শরীফকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, ইহাকে নিজের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন ও রাজপ্রাসাদের সমতুল্য বানাইয়াছেন ; ইহার চতুর্দিকের স্থানকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহার সম্মানার্থে উহার সীমার মধ্যে কোন প্রাণী শিকার ও কোন বৃক্ষ কর্তন হারাম করিয়াছেন। আরাফার ময়দানকে রাজপ্রাসাদের সম্মুখবর্তী দরবারভূমির ন্যায় নির্ধারণ করত কা'বা শরীফের সামনে রাখিয়াছেন যেন সর্বদিক হইতে বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্র পবিত্র গৃহে আগমন করিতে পারে। যদিও কোন নির্দিষ্ট স্থানে ও কা'বাগৃহে বাস করারূপ অপবাদ হইতে আল্লাহ্ একেবারে পবিত্র তথাপি মানুষের হৃদয়ে যখন প্রেমাবেগ প্রবল ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠে এবং মিলনের অভিপ্রায় সীমাহীন হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রিয়জনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। এইজন্যই আল্লাহ্ প্রেমে মত্ত মুসলমানগণ নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র পরিবার, সুখের বাসস্থান ও ধনসম্পদ ত্যাগ করত বিপদসঙ্কুল অরণ্য, ভীষণ সমুদ্র অতিক্রমপূর্বক প্রকৃত বান্দার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু ও একমাত্র প্রভু মহান আল্লাহ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে।

হজ্জের আদিষ্ট কার্যগুলির মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে দৌড় প্রভৃতি অবশ্য যুক্তির সাহায্যে বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায় না। বুদ্ধির আওতাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে প্রবৃত্তির কিছু না কিছু সম্পর্ক থাকে। কেননা, কমোর ফলকে হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিলেই মানুষ উহা করিতে আগ্রহান্বিত হয় এবং কর্মটি হিতকর হওয়াই তাহার কার্য সম্পাদনের কারণ হইয়া পড়ে। যেমন সে জানে, যাকাত প্রদানের মধ্যে অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহায়তা ও সৌজন্য প্রদর্শন আর নামাযে আল্লাহ্র সম্মুখে দীনতা-হীনতা প্রকাশ রহিয়াছে এবং রোযা দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমিত ও শয়তানের শক্তি খর্ব হয়। বুদ্ধির নির্দেশানুসারে মানুষ এই সকল কার্য সম্পন্ন করে বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু লাভ-লোকসানের প্রতি একেবারেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রভুর

আদেশ পাওয়ামাত্রই কাজ সম্পন্ন করাকেই প্রকৃত বন্দেগী বলে। কঙ্কর নিক্ষেপ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে দৌড় এই শ্রেণীর কার্য। কেননা, শুধু প্রভুর আদেশ মান্য করা ব্যতীত অন্য কোন কারণে এরূপ কার্য কেহই করিতে পারে না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন–

لبيك لحجة حقا تعبد او رقا ـ

অর্থাৎ "হজ্জকে প্রকৃত সত্য, যথার্থ বন্দেগী ও সত্যিকারের দাসত্ব জ্ঞান করিয়া ইহার জন্য তোমার দরবারে উপস্থিত হইলাম।" হজ্জকে তিনি সত্যিকারের দাসত্ব ও বন্দেগী আখ্যা দিয়েছেন। হজ্জের মধ্যে ঐ প্রকার কার্যগুলির কোন যুক্তি নির্ণয় করিতে না পারিয়া কতক লোক হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। এই হয়রানি তাহাদের অজ্ঞতার কারণেই ঘটিয়াছে। কেননা ইহার প্রকৃত অবস্থা তাহারা অবগত নহে। বিনা উদ্দেশ্যই যে হজ্জের উদ্দেশ্য, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কারণে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্বের জন্যই হজ্জ। প্রবৃত্তি বা বুদ্ধিকে ইহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা করিতে পারিলে সকল কার্যেই মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া একেবারে অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করাতেই মানুষের পরম সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। তখন সমস্ত কার্যে তাহার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁহার আদেশের দিকেই থাকিবে।

হজ্জের উপদেশ ঃ হজ্জ-যাত্রা এক হিসেবে পরলোক যাত্রার সমতুল্য। কারণ, হজ্জ-যাত্রা কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে হয় এবং পরলোক যাত্রা কা'বা শরীফের অধিপতির উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অতএব, হজ্জ যাত্রার প্রত্যেক ঘটনায় পরলোকে যাত্রার অবস্থা স্মরণ করা উচিত। এই যাত্রাকালে পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ মৃত্যুকালে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সমতুল্য। হজ্জ-যাত্রার পূর্বে মানুষ যেমন পার্থিব সকল বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত হইয়া রওয়ানা হয় তদ্রূপ শেষ বয়সে পরকাল-যাত্রার পূর্বে দুনিয়ার সকল চিন্তা হইতেও তাহার মনকে মুক্ত করা আবশ্যক। অন্যথায় পরকাল-যাত্রা নিতান্ত যন্ত্রণাদায়ক হইবে। হজ্জে যাওয়ার সময় যেরূপ যথেষ্ট পরিমাণে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং যাহাতে উহা বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হইয়া নির্জন মরুপ্রান্তরে সম্বলহীন হইয়া পড়িতে না হয় তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তদ্রূপ পরকালে ভয়ঙ্কর বিপদ সমাকীর্ণ হাশরের মাঠ অতিক্রম করার জন্য দুনিয়া হইতে পরলোকে মঙ্গলজনক সওয়াবও প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে লওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সে সওয়াবকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত

পাহারা দেওয়া উচিত। হজ্জে যাত্রাকালে হাজীগণ যাহা সহজে বিনষ্ট হয় এমন দ্রব্য সঙ্গে লয় না। কারণ, তাহারা জানে যে, উহা অস্থায়ী হওয়ার দরুন পাথেয়ের উপযোগী নহে। এইরূপ যে ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে এবং যে ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ, উহাও পরলোক-যাত্রার সম্বল হইতে পারে না। হজ্জ-যাত্রাকালে যানবাহনে আরোহণপূর্বক পরকালের পথে জানাযায় আরোহণের কথা স্মরণ করিবে। কারণ, ইহা অবশ্যই জানা আছে যে, হজ্জের-পথে বাহনের ন্যায় কবরে যাইবার পথেও বাহন পাওয়া যাইবে। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, হজ্জের সওয়ারী হইতে অবতরণের সময় মিলিবে না; বরং তখনই জানাযার আরোহণের সময় আসিয়া পড়িবে। হজ্জের সফর এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে উহা পরকালের সফরের পাথেয় হওয়ার উপযোগী হয়। ইহরাম বাঁধিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ প্রচলিত পোশাক পরিত্যাগপূর্বক ইহ্‌রামের সাদা ও সেলাইবিহীন দুইটি চাদর পরিধান করিবার সময় পরলোক-গমনের পথে কাফনের কাপড়ের কথা স্মরণ করিবে। কারণ, কাফনের কাপড়ও সাধারণ প্রচলিত পোশাক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে। পাহাড় ও অরণ্যের বিপদাপদের সম্মুখীন হইলে কবরের মনকার-নাকীর ফেরেশতা ও সাপ-বিচ্ছুর কথা স্মরণ করিবে। কবর হইতে হাশরের ময়দান পর্যন্ত বিপদাপদ পরিপূর্ণ অতি বৃহৎ অরণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। পথপ্রদর্শনের সহায়তা ব্যতীত যেমন গভীর অরণ্যে বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, ইবাদত ব্যতীত তদ্রূপ কবরের বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় নাই। হজ্জের পথে অরণ্য দিয়া যাইবার সময় যেমন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করত একাকী চলিতে হয়, কবরেও তদ্রূপ একাকী যাইতে হয়। 'লাব্বায়েক' বলিবার সময় মনে করিবে, ইহা আল্লাহ্‌র আহ্বানের উত্তরমাত্র। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনা যাইবে। সেই আহ্বানের ভয়ের কথা স্মরণ করিবে এবং ইহার আশঙ্কায় নিমজ্জিত থাকিবে।

ইহরামের সময় হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিত, সমস্ত শরীর ভয়ে কম্পিত হইত এবং 'লাব্বায়েক' উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি 'লাব্বায়েক' বলেন না কেন?" তিনি বলিলেন– "লাব্বায়েক বলিলে 'লা লাব্বায়েক' বলেন না কেন?" তিনি বলিলেন–"লাব্বায়েক বলিলে 'লা লাব্বায়েক' (অর্থাৎ তুমি মনে প্রাণে আমার দরবারে উপস্থিত হও নাই) উত্তর আসে কিনা, আমার এই ভয়।" এই বলিয়াই তিনি বেহুঁশ হইয়া উটের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র)-এর মুরীদ হযরত আহমদ ইবনুল হওয়ারী (র) বলেন যে, "তাঁহার পীর ইহরাম বাঁধিয়া

"লাব্বায়েক" বলিতে পারে না। এমতাবস্থায় এক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। তৎপর চেতনা লাভ করিয়া তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ্ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল করিয়াছিলেন ঃ "তোমার অত্যাচারী উম্মতদিগকে আমাকে স্মরণ করিতে ও আমার নাম লইতে নিষেধ কর। কারণ, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি। কিন্তু স্মরণকারী অত্যাচারী হইলে আমি তাহাকে অভিশাপের সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।" তৎপর তিনি আরও বলেন– "আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক মাল হইতে হজ্জের পাথেয় সংগ্রহ করে, সে যদি 'লাব্বায়েক' বলে, ইহার উত্তরে তাহাকে বলা হয়–"তোমার হস্তস্থিত পাথেয় যে পর্যন্ত ইহার হকদারকে ফিরাইয়া না দিবে সে পর্যন্ত তোমার 'লাব্বায়েক' আমি কবূল করিব না।

কা'বা শরীফের তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ার দৃষ্টান্ত এইরূপ– যেমন, কোন দীনহীন অসহায় ব্যক্তি শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বাদশাহের নিকট স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে এবং রাজপ্রাসাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মধ্যে মধ্যে দরবারে যাতায়াত করে এবং সুপারিশ করিবার লোক খুঁজিতে থাকে। আর তদ্সঙ্গে বাদশাহের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাহার প্রতি আকর্ষণের এবং বাদশাহ্কে স্বচক্ষে দর্শনের আশাও হৃদয়ে পোষণ করিতে থাকে। ঠিক তদ্রূপ হাজীগণ কা'বা শরীফের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে আল্লাহ্র দর্শনের আশায় দৌড়াদৌড়ি করে ; তৎপর আরাফার দরবারভূমিকে স্বীয় দুঃখ নিবেদনের জন্য সর্বসঙ্গে উপস্থিত হয়। আরাফার ময়দানের জগতের সকল দেশ হইতে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক যখন সমবেত হইয়া নিজ নিজ ভাষায় প্রার্থনা করিতে থাকে তখনকার দৃশ্যটি কিয়ামত দিবস হাশরের ময়দানে সমস্ত জগতের লোক সমবেত হওয়ার অনুরূপ। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকিবে, প্রত্যেকেই অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয়ে অধীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে।

কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হইল একদিকে ইবাদতরূপে প্রকৃত বন্দেগী প্রকাশ এবং অপরদিকে এই কার্য হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের কার্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখে। উক্ত স্থানে শয়তান আসিয়া হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের অন্তরে সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। এইজন্যই তিনি শয়তানের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তোমার মনে যদি এই ধারণা উদ্রেক হয় যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম স্বচক্ষে শয়তানকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমি তো দেখিতে

পাইতেছি না ; এমতাবস্থায় অনর্থক প্রস্তর নিক্ষেপ করিব কেন? এইরূপ ধারণা তোমার হৃদয়ে উদিত হইলে মনে করিবে, শয়তান প্ররোচনা দ্বারা তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিনা দ্বিধায় প্রস্তর নিক্ষেপ করত তুমি শয়তানের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দাও। প্রস্তর নিক্ষেপ অবশ্যই শয়তানের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। আর তুমি নিজকে আল্লাহ্র প্রকৃত আজ্ঞাবহ দাস বলিয়া প্রমাণ কর, তাঁহার উপর উৎসর্গ করিয়া দাও। আর বিশ্বাস কর, "প্রস্তরাঘাতে আমি শয়তানকে শাস্তি দিলাম এবং পরাজিত করিলাম।"

হজ্জ হইতে প্রাপ্ত উপদেশাবলীর এত বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের উদ্দেশ্য এই– ইহা যদি কোন ব্যক্তি সামান্য জ্ঞানও জন্মে তবে তাহার বুদ্ধিমত্তা, অনুরাগ ও চেষ্টা অনুযায়ী উহার গূঢ় রহস্য তাহার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এবং প্রতিটি কার্য হইতে সে নির্ধারিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। ইহাই ইবদতের প্রাণ। আর এই অর্থ বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক কার্যের বাহ্য আকৃতি হইতে ইহার আধ্যাত্মিক গূঢ় মর্মের দিকে সে অধিকতর অগ্রসর হইতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফযীলত ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বিশেষত নামাযে দণ্ডায়মান হইয়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সমস্ত ইবাদতের মধ্যে উত্তম। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার উম্মতের ইবাদতের মধ্যে কুরআন শরীফ পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম ইবাদত। তিনি বলেন–"আল্লাহ্ যাহাকে কুরআনরূপ নিয়ামত দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, অপর কাহাকেও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করা হইয়াছে, তবে আল্লাহ্ যাহাকে সম্মান দান করিয়াছেন তাহাকে সে তুচ্ছ করিল।" তিনি আরও বলেন–"কুরআন শরীফকে কোন চর্মের মধ্যে রাখিলে অগ্নি ইহার নিকটেই যাইবে না।" তিনি অন্যত্র বলেন– "কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র দরবারে কোন ফেরেশতা, পয়গম্বর বা অন্য কেহ কুরআন শরীফ অপেক্ষা অধিক সুপারিশ করিতে পারিবে না।" তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ "কুরআন শরীফ পাঠে লিপ্ত থাকার দরুন যে ব্যক্তি দু'আ করিতে পারে না, আমার শোকরগুযার বান্দাগণের শ্রেষ্ঠ পুণ্য তাহাকে প্রদান করিব।" রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন– "লোহার ন্যায় মানুষের অন্তরে মরিচা ধরে।" নিবেদন করা হইল– "হে আল্লাহ্র রাসূল, সেই মরিচা কিসে দূর হয়?" হযরত (সা) বলিলেন– "কুরআন শরীফ পাঠে ও মৃত্যুর স্মরণে।" তিনি বলেন– "আমি দুনিয়া হইতে চলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে দুইজন উপদেষ্টা রাখিয়া যাইতেছি। তাহারা সর্বদা তোমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিবে ও সুনীতি শিক্ষা দিবে। তাহাদের একটি সবাক ও অপরটি নির্বাক। সবাক হইল কুরআন শরীফ, আর নির্বাক হইল মৃত্যু।" হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহ আন্হু বলেন– "কুরআন শরীফ পাঠ কর। ইহার প্রত্যেকটি অক্ষরের বিনিময়ে দশ দশটি নেকী পাওয়া যায়। আমি বলিতেছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' এক অক্ষর; বরং 'আলিফ' এক অক্ষর 'লাম' এক অক্ষর এবং 'মীম' এক অক্ষর।" হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন—"আমি আল্লাহ্কে স্বপ্নযোগে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"হে আল্লাহ্, তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য কোন্ বস্তুর উসিলা উত্তম!" আল্লাহ্ বলিলেন—"আমার বাণী কুরআন শরীফের উসিলা।" আমি আবার নিবেদন করিলাম, "উহার অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক উভয় অবস্থাতেই", আল্লাহ্ বলিলেন—"হ্যাঁ অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক।"

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের আদব ঃ কুরআন শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা অতি উচ্চ। অতএব কুরআন শরীফের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং অসঙ্গত কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা কুরআন শরীফ পাঠকারীর আবশ্যক। কুরআন শরীফের সম্মুখে সর্বদা শিষ্টতার সহিত থাকা কর্তব্য। অন্যথায় কুরআন শরীফই তাহার পরম শত্রু হইয়া পড়িবার আশঙ্কার রহিয়াছে। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আমার উম্মতের মধ্যে মুনাফিক অধিকাংশ কুরআন পাঠকেরাই হইবে।" হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন—'দোযখের ফেরেশতা মূর্তিপূজকদিগকে ধরিবার পূর্বে কুরআন পাঠক ফাসাদকারীদিগকেই ধরিবে।" তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন—"হে মানব, তোমরা লজ্জা করো না? তোমার প্রিয়জনের কোন পত্র পাইলে তুমি চলার পথে থাকিলেও তৎক্ষণাৎ থামিয়া বা পথিপার্শ্বে বসিয়া ইহার প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িয়া থাক এবং বিশেষভাবে প্রণিধানপূর্বক উহার অর্থ বুঝিয়া লও। কিন্তু আমার এই কিতাব আদেশ পত্রস্বরূপ তোমার নিকট পাঠাইয়াছি যেন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা পাঠ কর এবং তদনুযায়ী কাজ কর। কিন্তু তোমরা ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছ এবং তদনুযায়ী কাজ করিতেছ না। তোমাদের মধ্যে যাহারা ইহা পাঠ করিতেছে তাহারাও উহাতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতেছে না।" হযরত হাসান বসরী (র) বলেন—"পূর্বকালের লোকেরা কুরআন শরীফকে আল্লাহ্র নিকট হইতে আগত একখানি নির্দেশনামা বলিয়া মনে করিতেন, রাত্রিকালে বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা বুঝিয়া লইতেন এবং দিবসে তদনুযায়ী কাজ করিতেন। তোমরা কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেছ এবং ইহার প্রতিটি হরফের যের ও যবর ঠিক করিতেছ; কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করিতে শৈথিল্য করিতেছ।"

মোটকথা, কুরআন শরীফের আসল উদ্দেশ্য তদনুযায়ী কাজ করা, শুধু পাঠ করা নহে। অবশ্য স্মরণ রাখিবার জন্য পাঠের আবশ্যক এবং উহার নির্দেশানুসারে কাজ করিবার জন্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ করে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন, কোন দাসের নিকট তাহার প্রভুর নিকট হইতে একখানা নির্দেশনামা আসিল। উহাতে দাসের প্রতি প্রভুর আদেশ-নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। দাস উহা পড়িতে বসিল এবং অতি মিষ্টি সুরে আবৃত্তি করিতে লাগিল ও উহার প্রতিটি অক্ষর খুব বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে লাগিল; কিন্তু উহাতে লিখিত আদেশ-নিষেধের কিছুই পালন করিল না। এমতাবস্থায় সেই দাস প্রভুর কঠিন আক্রোশে পতিত হইয়া ভীষণ শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের বাহ্য নিয়ম ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় ছয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যথা—

(১) ভক্তি সহকারে কুরআন শরীফ পাঠ করিবে। প্রথমে ওযূ করত কিবলার দিকে মুখ করিয়া বসিবে এবং নামাযের ন্যায় খুব দীনতা ও মিনতির সহিত কুরআন শরীফ পড়িবে; হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন শরীফ পড়ে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে শত শত নেকী লিখিত হয় এবং যে ব্যক্তি বসিয়া নামায পড়ে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে পঞ্চাশ নেকী লিখিত হয়; যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত অন্য সময় ওযূর সহিত কুরআন শরীফ পাঠ করে তাহার জন্য প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে পঁচিশ নেকী লিখিত হয়। আর বিনা ওযূতে (স্পর্শ না করিয়া) কুরআন শরীফ পাঠ করিলে প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশ নেকীর অধিক লিখিত হয় না।" রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন শরীফ পাঠ অতি উত্তম। কারণ, তখন খুব একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়।

(২) ধীরে ধীরে পড়িবে এবং অর্থের দিকে মনোনিবেশ করিবে; তাড়াতাড়ি খতম করিবার চেষ্টায় থাকিবে না। কোন কোন লোকে প্রত্যহ এক খতম করিয়া থাকে; রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করে সে ইহাতে নিহিত ধর্ম-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াআল্লাহু আনহু বলেন ঃ যদি 'ইযাযুল যিলাতিল আরদু' ও 'আলকারিয়াতু' (ক্ষুদ্র সূরাদ্বয়) আস্তে আস্তে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর তবে ইহা (কুরআন শরীফের সর্ববৃহৎ দুই সূরা) 'বাকারাহ' ও 'আলে ইমরান' তাড়াতাড়ি পড়া অপেক্ষা আমার অধিক পছন্দনীয়।" হযরত আয়েশা (রা) এক ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফ পড়িতে শুনিয়া বলিলেন ঃ "এ ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছে না, চুপ করিয়া নাই।" অনারব কুরআন শরীফের অর্থ না বুঝিলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করা তাহার উচিত।

(৩) কুরআন শরীফ পাঠকালে রোদন কর। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং রোদন কর। রোদন না আসিলে চেষ্টা করিয়া রোদনের ভাব আনয়ন কর।" হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন ঃ 'সুবহানাল্লাযী' সূরা পাঠের সময় সিজদার আয়াত পাঠ করিলে ক্রন্দনের পূর্বে সিজদা করিবে না। চক্ষু ক্রন্দন না করিলেও অন্তরে ক্রন্দন করা উচিত। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বিলাপ করিবার জন্য কুরআন শরীফ নাযিল হইয়াছে। সুতরাং ইহা পাঠকালে নিজকে বিষণ্ন বানাও।" কুরআন শরীফে যে সকল শুভ সংবাদপূর্ণ ও ভীতি প্রদর্শক আয়াত রহিয়াছে উহাদের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে এবং নিজের অক্ষমতা ও দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিলে পরকালের প্রতি একেবারে উদাসীন ব্যতীত সকলের হৃদয় আপনা আপনিই দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে।

(৪) প্রত্যেক আয়াতের প্রতি কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করিবে। কারণ রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আযাবের আয়াত পাঠকালে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন, রহমতের আয়াত পাঠকালে রহমতের প্রার্থনা করিতেন এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতাসূচক আয়াত পাঠ করিবার সময় তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করিবার সময় 'আউযু বিল্লাহ্' পড়িতেন এবং তিলাওয়াত শেষ করিয়া এই দু'আ পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِى بِالْقُرْاٰنِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً
اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ و عَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ
اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اَصْرُفَ النَّهَارِ وَ اجْعَلْهُ حُجَّةً لِّىْ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ কুরআন শরীফের উসিলায় তুমি আমার উপর অনুগ্রহ কর এবং উহাকে আমার জন্য পরিচালক, আলো, পথপ্রদর্শক এবং রহমতস্বরূপ কর। ইয়া আল্লাহ্! উহা হইতে আমি যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং উহার যাহা কিছু জানি না তাহা আমাকে শিখাইয়া দাও। আর আমাকে দিবারাত্র উহা তিলাওয়াতের তওফীক দান কর এবং হে বিশ্বপালক, উহাকে আমার জন্য দলিলস্বরূপ করিয়া দাও।

সিজদার আয়াত পাঠ করিয়া প্রথমে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলিয়া পরে সিজদা করিবে। নামাযের জন্য পবিত্রতা অবলম্বন ও সতর ঢাকা ইত্যাদি শর্তপালন যেমন অপরিহার্য তদ্রূপ তিলাওয়াতের সিজদার জন্য এই শর্তগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে। তবে "আল্লাহু আকবর" বলিয়া সিজদা করিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে বা সালাম ফিরাইতে হইবে না।

(৫) তিলাওয়াতের সময় লোক-দেখানো মনোভাব জন্মিবার আশঙ্কা হইলে কিংবা অন্যের নামাযে ক্ষতি হইলে চুপে চুপে তিলাওয়াত করিবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "গোপনে দান করা যেমন প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম তদ্রূপ চুপে চুপে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত প্রকাশ্য তিলাওয়াত অপেক্ষা উত্তম।" কিন্তু লোক-দেখানো ভাব জন্মিবার ও অপর লোকের নামাযের ক্ষতি হইবার আশঙ্কা না থাকিলে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করাই উত্তম। তাহাতে অপর লোকে শুনিয়া খুব উপকৃত হয় ও তাহাদের প্রভূত জ্ঞান লাভ হয়। স্বয়ং পাঠকের সহযোগিতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং তন্দ্রা দূরীভূত হয় ও অপর নিদ্রিত ব্যক্তিরও ঘুম ভাঙ্গে। এই সকল নিয়তে উচ্চস্বরে

তিলাওয়াত করিলে প্রত্যেকটি নিয়তের জন্য পৃথক পৃথক সওয়াব পাওয়া যায়। মুখস্থ পড়া অপেক্ষা দেখিয়া পড়াই উত্তম; কারণ, ইহাতে চক্ষুকে সৎকাজে নিয়োজিত করা হইবে। কথিত আছে, দেখিয়া এক খতম করা মুখস্থ সাত খতমের সমান।

মিসর দেশীয় লোকজন ফিকাহশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিম হযরত ইমাম শাফেঈ (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি সিজদায় পড়িয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে কুরআন শরীফ স্থাপিত রহিয়াছে। তৎপর হযরত ইমাম সাহেব (র) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ "ফিকাহশাস্ত্র তোমাদিগকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত হইতে বিরত রাখিয়াছে। আমি ইশার নামায সমাধা করত কুরআন শরীফ পড়িতে আরম্ভ করি এবং ভোর পর্যন্ত পড়িতে থাকি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আবূ বকর (র) গৃহে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, রাত্রিকালে তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া নীরবে কুরআন শরীফ পাঠ করিতেছেন। হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "নীরবে পড়িতেছ কেন?" হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন ঃ "কারণ, যাহার নিকট আমি নিবেদন করিতেছি, তিনি শুনেন।" অপর দিকে হযরত (সা) হযরত উমর (রা) উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি নিদ্রিত লোকদিগকে জাগ্রত করিতেছি এবং শয়তানকে বিতাড়িত করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন ঃ "তোমরা উভয়েই উত্তম কার্য করিতেছ। এইরূপ কার্যের ফল নিয়ত অনুযায়ী হইয়া থাকে।" তাঁহাদের উভয়ের নিয়তই উত্তম ছিল। এইজন্য উভয়েই সওয়াব পাইবেন।

(৬) সুমিষ্ট স্বরে কুরআন শরীফ পড়িবার চেষ্টা করিবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সুমিষ্ট স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া ইহার শোভা বৃদ্ধি কর।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ হুযাইফার প্রভুকে মধুর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مِثْلَهٗ -

অর্থাৎ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি এইরূপ ব্যক্তিকে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।" ইহার কারণ, এই আওয়াজ যত মধুর হইবে হৃদয়ের উপর কুরআন শরীফের প্রতিক্রিয়াও তত অধিক হইবে। মধুর স্বরে কুরআন শরীফ পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু গায়কদের মত শব্দ ও অক্ষরগুলিকে গানের স্বরে পড়া মাকরূহ।

কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যন্তরীণ নিয়ম ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় ছয়টি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা ঃ

(১) কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিবে; ইহাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া জানিবে এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবে, এই কালাম অনাদি ও আল্লাহ্‌র একটি

গুণবিশেষ। এই গুণ তাঁহার সত্তার সহিত বিরাজমান। আমরা রসনা দ্বারা যাহা উচ্চারণ করি তাহা অক্ষরমাত্র। 'অগ্নি' শব্দটি মুখে বলা অতি সহজ, সকলেই উহা উচ্চারণ করিতে পারে। কিন্তু আসল অগ্নি কেহই মুখে লইতে পারে না। তদ্রূপ কুরআন শরীফের শব্দসমূহ সকলেই মুখে উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাদের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িলে সাত যমীন ও সাত আসমানও উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "আমি যদি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইতে যে, উহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কিন্তু কুরআনের গুরুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য শব্দ ও অক্ষরের আবরণে ঢাকিয়া গোপন রাখা হইয়াছে যেন রসনা অন্তর উহা ধারণ করিতে পারে। শব্দের আবরণে আবৃত করা ব্যতীত কুরআনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার অন্য কোন উপায়ই ছিল না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, শুধু শব্দ ব্যতীতও কুরআনের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। মানুষের ব্যবহৃত বাক্য দ্বারা চতুষ্পদ জন্তুকে আহ্বান করা বা শিক্ষা দেওয়া অথবা কোন কার্যে নিয়োগ করা চলে না; কারণ পশুরা মানুষের বাক্য বুঝিতে অক্ষম। এইজন্য ইহাদিগকে চালাইবার উদ্দেশ্যে ইহাদের অব্যক্ত শব্দের সহিত মানুষের কতকগুলি শব্দ মিলাইয়া এক প্রকার ভাষা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাষা প্রয়োগে পশুকে সতর্ক করা হয় এবং ইহা শুনিয়াই ইহারা কাজে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সেই কার্যের রহস্য ও উদ্দেশ্য পশুরা কিছুই জানে না। বলদকে হালে জুড়িয়া তদ্রূপ শব্দে পরিচালিত করিলে ইহারা হাল কর্ষণ করিতে থাকে; ফলে জমির মাটি উলট-পালট ও আলগা হয়। কিন্তু হাল-চাষের রহস্য ও উপকারিতা বলদ মোটেই বুঝে না। চাষ করা মাটির মধ্যে পানি ও বায়ু প্রবেশ করত বীজ অঙ্কুরের উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া উহাকে প্রতিপালন করিয়া তোলে। পশুদের ন্যায় কুরআন শরীফের শব্দ ও প্রকাশ্য অর্থ ছাড়া ইহার গূঢ় রহস্য বহু লোকে বুঝিতে পারে না। এমনকি কতক লোকে কুরআন শরীফকে কতকগুলি শব্দ ও অক্ষরের সমষ্টিমাত্রই বুঝিয়া লইয়াছে। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত দুর্বল ও মন পঙ্কিলতায় পূর্ণ। তাহারা এমন ব্যক্তিতুল্য, যে আগুনকে একমাত্র আগুন এই অক্ষরগুলির সমষ্টি বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে এবং উহা জানে না যে, আগুনে কাগজ নিক্ষেপ করিলে আগুন ইহাকে পোড়াইয়া ফেলে এবং কাগজ উহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। অথচ কাগজের উপর 'আগুন' শব্দটি লিখিলে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে এবং কাগজকে দগ্ধ করে না।

দেহের প্রাণ থাকে এবং এই প্রাণের কারণেই দেহ টিকিয়া থাকে। কুরআন শরীফের শব্দগুলির মর্মার্থ উহার প্রাণস্বরূপ এবং শব্দগুলি উহার দেহ। আত্মার কারণেই দেহের মর্যাদা এবং অর্থের কারণেই শব্দের গৌরব হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার পূর্ণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে।

(২) কুরআন শরীফ মহান আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া তাঁহার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তিলাওয়াত আরম্ভের পূর্বেই হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া লইবে এবং কাহার কালাম পাঠে ও কত বড় কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহাও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে। এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন—

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ -

অর্থাৎ "পবিত্রতা লাভ করিয়াছে এরূপ লোক ব্যতীত অপর কেহই ইহা স্পর্শ করিবে না।" পাক লোক ব্যতীত অপরে যেমন কুরআন-গ্রন্থ স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ কুস্বভাবের অপবিত্রতা হইতে অন্তর পাক-সাফ ও ভক্তি-শ্রদ্ধার আলোকে সুশোভিত না হইলে কুরআন শরীফের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এজন্যই কুরআন শরীফ খুলিবার সময় হযরত আকরামা (র)-এর হৃদয় ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িত এবং তিনি বলিয়া উঠিতেন ঃ هذا كلام ربى অর্থাৎ "ইহা আমার প্রভুর কালাম।" আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি না করা পর্যন্ত কেহই কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র গুণ ও কার্যাবলীর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ না করা পর্যন্ত তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্যকরূপে বুঝা যায় না। গভীরভাবে মনোনিবেশপূর্বক বুঝিয়া লইবে, আরশ, কুরসী, আসমান-যমীন এবং যাহা কিছু ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, যথা—ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, ধাতব পদার্থ, বৃক্ষ-তৃণলতাদি ও সমস্ত মখলুকাতই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন; এই সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিতে তাঁহার কোন বাধা নাই এবং ধ্বংস করিয়া দিলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্বের কোন প্রকার ত্রুটিও দেখা দিবে না; একমাত্র তিনিই এই সকলের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও আহারদাতা। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের-যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ করিতে পারে।

(৩) মনোযোগের সহিত কুরআন শরীফ পাঠ করিবে; অন্যমনস্ক হইবে না এবং প্রবৃত্তি যেন মনকে এদিক-ওদিক লইয়া যাইতে না পারে। উদাসীনতার সহিত যাহা পাঠ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করা হয় নাই মনে করিয়া পুনরায় পড়িয়া লইবে। উদাসীনতার সহিত কুরআন পাঠকারী এমন ব্যক্তি সদৃশ, যে মনোমুগ্ধকর বৃক্ষ-লতা ও পুষ্প-কলিকা সুশোভিত সুরম্য উদ্যানে প্রবেশ করিল; অথচ তথাকার মনোরম দৃশ্য ও বিস্ময়কর ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া আসিল।

কারণ, কুরআন শরীফ মুসলমানের জন্য মনোরম বিষয়বস্তু, বিস্ময়কর ব্যাপার ও গূঢ় রহস্যাবলীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করিলে হৃদয় অন্য কোন দিকেই লিপ্ত হইতে পারে না। কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফের অর্থ বুঝিতে না পারিলে তাহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। অর্থ না বুঝিলেও কুরআনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মনে পোষণ করত তিলাওয়াত করা আবশ্যক যেন মন এদিক-ওদিক ধাবিত না হয়।

(৪) কুরআন শরীফের প্রত্যেক শব্দের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। একবারে অর্থ না বুঝিলে পুনরায় পড়িবে। পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না, অথচ মন বেশ আনন্দ পাইল, তথাপি আবার পড়িবে। কারণ, অধিক পড়া অপেক্ষা অর্থ বুঝিয়া পড়াই উত্তম। হযরত আবূ যর (র) বলেন ঃ যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক দিন রাত্রিকালের নামাযে এই আয়াত বারবার পাঠ করিয়াছিলেন—

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থাৎ "তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও (তাহা তুমি করিতে পার)। কারণ তাহারা তোমারই দাস। আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর (তাহাও করিতে পার)। কেননা তুমি শক্তিশালী ও হিকমতওয়ালা।" আর সেই সময় তিনি বিশবার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িয়াছিলেন। হযরত সাআদ ইবনে যুবাইর (র) এক রাত্রি এই আয়াত পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন—

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ -

অর্থাৎ "হে গুনাহ্‌গারগণ, আজ পৃথক হইয়া যা।" এক আয়াত পড়িবার সময় অন্য আয়াতের অর্থের দিকে ধ্যান করিলে উক্ত পঠিত আয়াতের হক আদায় করা হয় না। হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ্ নামাযের মধ্যে তাঁহার মনে ওস্‌ওয়াসা আসে বলিয়া দুঃখ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মনে পার্থিব চিন্তা উদিত হয় কি?" তিনি বলিলেন ঃ "নামাযের মধ্যে পার্থিব চিন্তা উদিত হওয়া অপেক্ষা বরং আমার বক্ষে ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আমি সুখময় বলিয়া মনে করি। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হইব এবং কিরূপে তথা হইতে ফিরিব, এই সকল চিন্তাই অধিক উদিত হয়।" এইরূপ নির্দেশ আছে যে, নামাযে পঠিত আয়াতের মর্ম ব্যতীত নামাযের সময় অন্য কিছুর খেয়াল করা উচিত নহে। পঠিত আয়াতের মর্ম ব্যতীত ধর্মবিষয়ক অন্য চিন্তা নামাযের মধ্যে উদিত হইলেও ইহা ওস্‌ওয়াসার অন্তর্ভুক্ত। এই নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম নামাযের মধ্যে উক্তরূপ চিন্তাকেও অস্‌অসা বলিয়া মনে করিতেন। ফলকথা, কুরআনের যে আয়াত পাঠ করিবে সেই আয়াতের অর্থ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা করা উচিত নহে। আল্লাহ্‌র গুণ প্রকাশক

আয়াত পাঠকালে তাঁহার গুণের গূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে; যেমন, قدوس (পবিত্র) عزيز (শক্তিশালী), جبار (অসীম পরাক্রমশালী), حكيم (কৌশলময়) প্রভৃতি গুণ-প্রকাশক শব্দগুলির অর্থের দিকে মনোনিবেশ করিবে। তাঁহার কার্যাবলীয় প্রকাশক আয়াত যেমন خلق السموت والارض (তিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন) এই শ্রেণীর আয়াতসমূহ পাঠকালে বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দিকে মনোনিবেশপূর্বক সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিবে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও অবাধ ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হইবে যেন যাহা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার এবং তিনি ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই ও তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সত্য তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। اَنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ من نُّطفَة (নিশ্চয়ই মানুষকে আমি শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।) আয়াত পাঠকালে শুক্রের বিস্ময়কর গুণের বিষয় চিন্তা করিবে। এক বিন্দু নাপাক পানি হইতে কিরূপে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ যেমন গোশ্‌ত, চর্ম, অস্থি, শিরা ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন মস্তক, হস্ত-পদ, চক্ষু রসনা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার বিভিন্ন প্রকারের আশ্চর্য শক্তি যেমন শ্রবণ, দর্শন, প্রাণ ইত্যাদি কেমন করিয়া আসে। কুরআন শরীফের সকল অর্থ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবে কুরআনের আয়াত অবলম্বনে চিন্তা ও অনুধাবনের জন্য সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যেই উপরে যৎকিঞ্চিত বর্ণিত হইল।

তিন প্রকার লোক কুরআনের গূঢ় অর্থ বুঝিতে অক্ষম ঃ (ক) যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে না ও তফসীর পাঠ করে নাই। (খ) যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা যাহার হৃদয়ে কোন বিদআতী আকীদা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং উহার ফলে গুনাহ বিদআতের কালিমায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। (গ) তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে, ইহার প্রকাশ্য অর্থ যাহার হৃদয়ে এমনভাবে বসিয়া গিয়াছে যে, উহার বিরোধী কোন সত্য উপস্থিত হইলে ইহাকে সে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে। এমন ব্যক্তির পক্ষে তাহার বদ্ধমূল বিশ্বাস হইতে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভবপর। সুতরাং সে কুরআনে গূঢ় মর্ম অনুধাবন করিতে পারে না।

(৫) পঠিত আয়াত যে প্রকৃতির তিলাওয়াতের সময় মনকেও সেই প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। যেমন, ভয়সূচক আয়াত পাঠের সময় মনে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে; রহমতসূচক পাঠকালে মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিবে এবং আল্লাহ্ গুণাবলী প্রকাশক আয়াত পাঠকালে মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিবে এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক আয়াত পাঠকালে ভক্তি ও নম্রতায় অবনত হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্‌র প্রতি কাফিরদের আরোপিত মিথ্যা অপবাদ যেমন, তাঁহার শরীক আছে, তাঁহার পুত্র আছে, এই শ্রেণীর আয়াতসমূহ পাঠকালে কণ্ঠস্বর

মৃদু করিবে এবং লজ্জায় অবসন্ন হইয়া যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক আয়াত পাঠের সময় ইহার মর্ম অনুযায়ী মনোভাব পরিবর্তন করিয়া লইবে। তাহা হইলে আয়াতের প্রতি পাঠকের কর্তব্য পালন হইবে।

(৬) কুরআন শরীফ পড়িবার সময় মনে করিবে যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কুরআন শুনিতেছ। এক বুযর্গ বলেন ঃ "আমি কুরআন তিলাওয়াতে আনন্দ পাইতাম না। তৎপর মনে করিয়া নিলাম যে, আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক হইতে কুরআন পাঠ শুনিতেছি। ইহাতে আমি আনন্দ পাইলাম। ইহার পর মনে করিলাম যে, হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামের নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছি। ইহাতে আমার আরও আনন্দ বৃদ্ধি পাইল। অবশেষে আমার কল্পনাকে আরও উর্ধ্বে উন্নীত বড় মরতবা লাভ করিলাম। এখন এমনভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করি যেন কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে শ্রবণ করিতেছি। ইহাতে এমন আনন্দ পাইতেছি যে, ইতঃপূর্বে এরূপ আনন্দ কখনও পাই নাই।

নবম অধ্যায়

আল্লাহ্‌র যিকির

আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের প্রাণ ঃ আল্লাহ্‌র যিকির সকল ইবাদতের সারাংশ ও প্রাণ। এইজন্যই নামায ইসলামের স্তম্ভরূপে পরিগণিত। কারণ আল্লাহ্‌র যিকিরই নামাযের উদ্দেশ্য; যেমন আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

অর্থাৎ "অবশ্যই নামায ফাহেশা ও অশোভন কার্য হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্‌র যিকির অতি মহান।" কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এইজন্য সর্বোত্তম ইবাদত যে, ইহা পরম পরাক্রান্ত মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বাণী; উহা পাঠে আল্লাহ্‌র স্মরণ মনে উদিত হয় এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় আল্লাহ্‌র স্মরণকে সজীব করিয়া তোলে ও উহা আল্লাহ্‌র যিকিরের অন্যতম উপায়। কামনা ও লোভ খর্ব করা রোযার উদ্দেশ্য। কারণ, অতিরিক্ত কামভাব হইতে হৃদয় মুক্ত হইয়া পরিষ্কার ও প্রশান্ত হইয়া উঠিলে তথায় আল্লাহ্‌র যিকির বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। অপর দিকে কামনা ও লোভপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকির স্থান পাওয়া সম্ভব নহে এবং এরূপ অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকির ফলপ্রসূও হয় না। আল্লাহ্‌র গৃহ কা'বা শরীফ যিয়ারতকে হজ্জ বলে। কিন্তু কা'বা গৃহের অধিপতি আল্লাহ্‌র স্মরণ ও দর্শনাভিলাষকে হৃদয়ে দৃঢ়মূল করাই হজ্জের উদ্দেশ্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র যিকির হইল সকল ইবাদতের প্রাণ ও সারবস্তু। এমনকি, ইসলামের মূল শিকড় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা ও আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং অন্য সকল ইবাদত এই যিকিরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং ইহাকে মজবুত করিয়াও তোলে।

যিকিরের ফযীলত ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিলে তিনি তোমাকে স্মরণ করেন। ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রতিদান ও সফলতা আর কি হইতে পারে? আল্লাহ্ বলেন ঃ فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ অর্থাৎ "অনন্তর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" কারণ মানবের সৌভাগ্য ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ "লাভের আশা করিলে জানিয়া রাখ, অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিকির ইহার একমাত্র কুঞ্জী।" সুতরাং অধিক মাত্রায় যিকির কর, অল্প করিও না। অবিরতভাবে তাঁহার যিকির কর, মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়া নহে। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

অর্থাৎ "যাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করে (তাহারা বুদ্ধিমান)।" যাহারা সর্বাবস্থায় যিকির করেন আল্লাহ্ এস্থলে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আর তোমার প্রভুর যিকির কর ক্রন্দনের সহিত, ভীত বিহ্বল চিত্তে, অনুচ্চ বাক্যে ভোরে ও সন্ধ্যায় এবং কখনও গাফিল থাকিও না।"

কতিপয় লোক রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন্ কার্য সর্বাপেক্ষা উত্তম?" তিনি বলিলেন ঃ "মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র যিকিরে রসনা সিক্ত করা।" তিনি আরও বলেন ঃ "যে কার্য আল্লাহ্‌র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়, যে কার্যে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা নিহিত রহিয়াছে, যাহা স্বর্ণ রৌপ্য দান করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং যাহা আল্লাহ্‌র শত্রুদের সহিত এমন জিহাদ অপেক্ষা উত্তম যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে বধ করিতে থাক এবং তাহারা তোমাদিগকে শহীদ করিতে থাকে, আমি কি তোমাদিগকে এমন কার্যের সন্ধান দিব না? সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন—"ইহা কোন্ কার্য আমাদিগকে বলুন।" তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র যিকির।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন, যিকির যাহাকে আমার নিকট প্রার্থনা হইতে বিরত রাখে আমি তাহাকে প্রার্থনাকারীদের অপেক্ষা অধিক দান ও পুরস্কৃত করিয়া থাকি। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ "মৃত লোকের মধ্যে জীবিত লোক যেরূপ, শুষ্ক তৃণের মধ্যে সবুজ বৃক্ষ যেরূপ এবং জিহাদ হইতে পলাতক সৈন্যের তুলনায় বিজেতা বীরপুরুষ যেরূপ, আল্লাহ্‌র যিকিরে বিরত লোকের মধ্যে তাঁহার যিকিরকারীও তদ্রূপ। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (র) বলেন ঃ "বেহেশতবাসিগণের কোন বিষয়ে অনুতাপ থাকিবে না। কিন্তু দুনিয়াতে তাঁহাদের যে মুহূর্তটি আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হইয়াছে তজ্জন্য অনুতাপ হইবে।"

যিকিরের হাকীকত ঃ যিকিরকে চারিভাগে বিভক্ত করা চলে। যথা—(১) যে যিকির শুধু মুখে করা হয়, অন্তর তাহা হইতে অন্যমনস্ক ও উদাসীন থাকে। এরূপ যিকিরের প্রভাব খুব কম; কিন্তু একেবারে প্রভাবশূন্য নহে। কারণ, আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রসনা বেহুদা বাক্যালাপে লিপ্ত বা নিষ্কর্মা রসনা হইতে উৎকৃষ্ট। (২) এই শ্রেণীর যিকির মনের মধ্যে হয়; কিন্তু হৃদয়ে ইহা বদ্ধমূল নহে। চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে হৃদয়কে যিকিরে লিপ্ত রাখিতে হয়। চেষ্টা ও যত্ন না করিলে হৃদয় উদাসীনতায় বা রিপুর বশীভূত হইয়া ইহার প্রকৃতিগত স্বভাবে পুনরায় ফিরিয়া যায়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর যিকির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া ইহার উপর নিজের প্রবল প্রভাব বিস্তারপূর্বক মনকে সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রাখে এবং অনায়াসে মনকে অন্য কাজে লিপ্ত করা চলে না। ইহা মনের উৎকৃষ্ট অবস্থা। (৪) চতুর্থ প্রকার এই যে, যিকিরের বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্‌ সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজমান থাকেন এবং হৃদয় হইতে তখন কোন যিকির-ধ্বনি নির্গত হয় না। কারণ, যে হৃদয় স্মরণীয় বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্‌কে ভালবাসে এবং যে হৃদয় আল্লাহ্‌র যিকির ভালবাসে ইহাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং যিকির ও যিকিরের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে অন্তর হইতে বিদূরীত হইয়া কেবল যিকিরের বিষয় অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্‌ সমগ্র অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিলে উহাকেই যিকিরের সর্বোচ্চ সোপান বলে। যিকির আরবীতেই হউক, কি ফার্সীতেই হউক, ইহার বাগিন্দ্রিয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না; বরং ইহাকে বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত একমাত্র শব্দোচ্চারণ বলা চলে। আরবী, ফার্সী ইত্যাদি যাবতীয় ভাষায় শব্দ উচ্চারণে যিকির হইতে হৃদয় যখন একেবারে বিমুক্ত হইয়া পড়ে এবং অন্তর রাজ্যে একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্‌ই বিরাজমান থাকেন ও তথায় অন্য কোন বস্তুর প্রবেশের স্থান না থাকে তখনই মানব যিকিরের সর্বোচ্চ মরতবায় উপনীত হয়। মহব্বতের প্রাবল্যের ফলেই এই মরতবায় উপনীত হওয়া যায়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে আশিক একমাত্র মাশূকের দিকেই নিবিষ্ট থাকে। এমনও হয় যে, মাশূকের ধ্যানে আশিক মাশূকের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। মানুষ যখন এরূপ প্রিয়জনের ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিজেকে একেবারে ভুলিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু বিস্মৃত হয় তখন তাসাওওফের প্রথম ধাপে আরোহণ করে। সূফিগণ এই অবস্থাকে ফানা (বিলুপ্ত) ও নীস্ত (অনস্তিত্ব) বলিয়া থাকেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রভাবে ইহজগতের যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। এমনকি অবশেষে নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ্‌র এরূপ বহু জগত আছে যে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না; আমাদের নিকট এইগুলি নাই বলিয়াই বিবেচিত হয়। আর যে সমস্ত জগত সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি এইগুলি আমাদের নিকট আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। এই জড়জগত সকলের সম্মুখেই বিদ্যমান

রহিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্য ধ্যানে এই জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিকট ইহা নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইরূপ যদি কেহ নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায় তবে সে নিজেও নিজের নিকট অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে। তদ্রূপ যে অবস্থায় কাহারও নিকট একমাত্র আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু নাই বলিয়া বিবেচিত হয় সে অবস্থায় তাহার নিকট কেবল আল্লাহ্‌ বিরাজমান থাকেন।

এই দৃশ্যমান জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন পৃথিবী ও এই উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে কেবল তাহাই দেখিতে পাও এবং এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে না পাও তখন তুমি মনে করিবে এই সকল ব্যতীত আর কিছুই নাই; যাহা কিছু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে উহাই সমগ্র বিশ্ব। এইরূপ সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণপূর্বক যিকিরকারী আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া বলিয়া উঠেন 'হামাউস্ত' অর্থাৎ সমস্তই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই সোপানে উপনীত হইলে যিকিরকারী ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রকার দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে না বরং আল্লাহ্‌র সহিত তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা লাভ হয়। ইহা তাওহীদ ও ওহ্‌দানিয়াতের প্রথম ধাপ অর্থাৎ ইহাতে পার্থক্য দূরীভূত হয়। পার্থক্য ও দ্বিত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাহার থাকে না। কারণ, পার্থক্য ও দ্বিত্ব এমন ব্যক্তিই দেখিতে পায় যে-ব্যক্তি পৃথক পৃথক দুইটি বস্তু উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিজের ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর যিকিরকারী নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অপর কোন বস্তুই তাহার জ্ঞানে নাই। এমতাবস্থায় সে কিরূপে পার্থক্য ও দ্বিত্ব উপলব্ধি করিবে? মানব এই স্তরে উপনীত হইলে ফেরেশতাগণের আকৃতি দেখিতে পায়। ফেরেশতা ও নবীগণের আত্মাসমূহ সুন্দর সুন্দর আকৃতিতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। যে সকল বস্তু একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট উহাও তাহার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে; এমন মহান মহান অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশিত হইতে থাকে যাহার বর্ণনা সম্ভব নহে। এরূপ অবস্থা হইতে নিজত্বে ফিরিয়া আসিয়া সে পার্থিব বস্তুসমূহ দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে পারিলেও পূর্ব অবস্থার প্রভাব তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই অবস্থা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। পৃথিবী, পার্থিব বস্তুসমূহ এবং মানুষের যাবতীয় পার্থিব কার্য তাহার নিকট বিস্বাদ ও অপছন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি সশরীরে মানব সমাজে বাস করে বটে; কিন্তু তাহার আত্মা মানব সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া বহু উর্ধ্বে অবস্থান করে। পার্থিব কার্যে লিপ্ত বলিয়া দুনিয়াদারদের প্রতি এই শ্রেণীর লোক বিস্ময়ের চোখে দেখিয়া থাকেন। সাধারণ দুনিয়ার মোহ দেখিয়া এ সমস্ত বুযর্গের দয়ার্দ্র হওয়া ও বিস্ময়ের দৃষ্টিতে অবলোকন করার কারণ এই যে, তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন, পার্থিব কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ইহারা কত বড় মহান সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অথচ দুনিয়াসক্ত লোকেরাই এই সমস্ত বুযর্গকে সংসার বিরাগী দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে এবং মনে করে, তাঁহারা পাগল হইয়া গিয়াছেন।

'ফানা' ও 'নীস্তি'র উপরোক্ত অবস্থায় উপনীত না হইলে এবং 'কাশ্‌ফ্‌' হাসিল না হইলেও আল্লাহ্‌র যিকির যদি হৃদয়ে প্রবল থাকে তবে ইহাকেও সৌভাগ্যের পরশমণি বলা চলে। কারণ, হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকির প্রবল থাকিলে আপনা-আপনিই তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি, অবশেষে পৃথিবী ও পার্থিব যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা আল্লাহ্‌কে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় করিয়া তোলে। ইহাই সৌভাগ্যের মূল। কেননা মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র দীদারের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহ্‌-প্রেমিকগণ তাঁহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার তারতম্যানুসারে মৃত্যুতে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সংসারাসক্ত ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি তাহার ভালবাসার তারতম্যানুসারেই মৃত্যুকালে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। এই বিষয় দর্শন খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

যথেষ্ট পরিমাণে যিকির করিয়াও যে ব্যক্তি সুফিগণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই তাহার নিরাশ হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঐ অবস্থা প্রাপ্তির উপর সৌভাগ্য নির্ভর করে না; যিকিরের আলোকে হৃদয় আলাকিত হইলেই ইহা সৌভাগ্য লাভের উপযোগী হইয়া থাকে। পূর্ব-বর্ণিত আলৌকিক অবস্থার যাহা তাহার নিকট ইহজগতে প্রকাশ পায় নাই মৃত্যুর পর উহা তাহার নিকট প্রকাশিত হইবে। অতএব, আল্লাহ্‌র ধ্যান ও যিকির সর্বদা নিমগ্ন থাকাই মানুষের কর্তব্য; যেন সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সহিত মনের সংযোগ লাগিয়া থাকে এবং মন কখনও তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকে। কারণ, অবিরাম যিকির তাঁহার সান্নিধ্য লাভের এবং তাহার সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও অপার মহিমার পরিচয়ের কুঞ্জী। এই অর্থেই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি বেহেশতের উদ্যানে বিচরণ করিবার বাসনা রাখে আল্লাহ্‌র যিকির খুব অধিক করা তাহার কর্তব্য।"

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, যিকির সকল ইবাদতের সারাংশ। আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কার্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করত তাঁহার আদেশ পালন করিলে এবং নিষিদ্ধ পাপকার্য হইতে বিরত থাকিলেই বুঝা যায় যিকির যথার্থ হইয়াছে। যিকির যদি মানুষকে এই অবস্থায় উন্নীত করিতে না পারে তবে অবশ্যই বুঝিবে যে, ঐ যিকির মৌখিক শব্দোচ্চারণ ছিল মাত্র; খাঁটি যিকির ছিল না।

তস্‌বীহ, তাহ্‌লীল, তামহীদ, দরূদ শরীফ ও ইস্তিগফারের ফযীলত ঃ (তাহলীল অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা) রাসূলে মাকবূল সাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "বান্দা যে নেক কাজ করে কিয়ামত দিবসে তাহা মাপদণ্ডে ওজন করা হইবে। কিন্তু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' কলেমা এক পাল্লায় রাখিয়া সাত আসমান ও সাত যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপর পাল্লায় রাখিলে উক্ত কলেমার পাল্লাই ভারী হইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ "খাঁটি অন্তকরণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'

পাঠকারীর যমীনের বালুরাশির সমপরিমাণ অসংখ্য পাপ থাকিলেও মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।" তিনি অন্যত্রও বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সে বেহেশতে যাইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْر -

প্রত্যহ একশতবার পাঠ করে সে দশটি ক্রীতদাসকে মুক্তিদানের সওয়াব পাইবে এবং তার আমলনামায় একশত সওয়াব লিখিত হইবে ও একশতটি গুনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে এবং রাত্রি পর্যন্ত এই কলেমা তাহার জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় হইবে।" সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যে, ব্যক্তি এই কলেমা পাঠ করিবে সে যেন হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামের বংশের চারিজন ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান করিল।

তস্‌বীহ ও তামহীদ ঃ (তাস্‌বীহ অর্থ 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং তামহীদ অর্থ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা)। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি রোজ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ একশত বার পড়িবে তাহার গুনাহ্‌ সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের ন্যায় অসী হইলেও সমস্তই মাফ করিয়া দেওয়া হইবে" তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহু', তেত্রিশবার 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়িয়া পরিশেষে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْر -

এই কলেমা পড়িয়া একশত পূর্ণ করে তাহার গুনাহ্‌ সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় অসংখ্য হইলেও সমস্তই ক্ষমা করিয়া দেওয়াই হইবে।" এক ব্যক্তি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, দুনিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আমি রিক্ত হস্ত, অভাবগ্রস্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। আমার কোন উপায় আছে কি?" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ

"তুমি কোথায় আছ? যে তসবীহ্‌র বরকতে ফেরেশতা ও মানুষ জীবিকা পাইয়া থাকে তাহা কি তুমি জান না? সে ব্যক্তি নিবেদন করিল–"ইহা কি?" হযরত (সা) বলিলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

প্রত্যহ ফজরের নামাযের পূর্বে একশতবার পড়িবে, দুনিয়া আপনা আপনিই তোমার দিকে ফিরিবে এবং আল্লাহ ইহার এক একটি শব্দ হইতে এক একজন ফেরেশতা পয়দা করত কিয়ামত পর্যন্ত তসবীহ্ পাঠে নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং উহার সওয়াব তুমি পাইবে" তিনি আরও বলেন ঃ "এই কলেমাগুলি চিরস্থায়ী সওয়াব লাভের উপায়।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ -

তিনি ইহাও বলেন ঃ আমি এই কলেমাগুলি পড়িয়া থাকি এবং ইহাদিগকে সূর্যের নিম্নস্থ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা অধিক ভালবাসি।" তিনি আর বলেন ঃ "এই চারি কলেমাই আল্লাহ্‌র সমস্ত কলেমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" তিনি বলেন ঃ "দুইটি কলেমা উচ্চারণ খুব সহজ; কিন্তু মাপদন্ডে অতি ভারী এবং আল্লাহ্‌র নিকট খুব প্রিয়" (তাহা এই)

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ -

গরীবেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, ধনী লোকেরা সব সওয়াব লইয়া গেল। কারণ, আমরা যে ইবাদত করি তাহারাও উহা করিয়া থাকেন এতদ্ব্যতীত তাহারা দান করিয়া থাকে এবং (গরীব বলিয়া) আমরা দান করিতে পারি না।" তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ দরিদ্রতার কারণে তোমাদের প্রত্যেকটি তস্‌বীহ, তাহলীল ও তাক্‌বীর এক একটি দানস্বরূপ। তদ্রূপ তোমাদের প্রতিটি সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে প্রতিরোধও এক একটি দানতুল্য। আর তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের মুখে যে গ্রাস তুলিয়া দাও তাহাও দান বলিয়া গণ্য।"

দরিদ্রের তস্‌বীহে ফযীলতের কারণ ঃ দরিদ্রের তস্‌বীহ-তাহলীলে অধিক ফযীলতের কারণ এই যে, তাহাদের অন্তর সংসারের আবিলতা হইতে নির্মল থাকে। তাহাদের এক তস্‌বীহ আগাছামুক্ত উর্বর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় যাহা অতি শীঘ্র অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া যথেষ্ট পরিমাণে পূণ্যরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অপরপক্ষে ধনীদের হৃদয় দুনিয়ার লোভ-লালসায় পরিপূর্ণ। তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র যিকিররূপ বীজ ক্ষার ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় অতি অল্প ফল প্রদান করিয়া থাকে।

দরূদ শরীফের ফযীলত ঃ একদা রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম অতি প্রসন্ন চিত্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন ঃ "হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আসিয়াছিলেন। তিনি শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন যে,

আল্লাহ্ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে, আমি তাহার উপর দশবার রহমত নাযিল করিব। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার সালাম প্রেরণ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম প্রেরণ করিব। ইহাতে কি আপনি সন্তুষ্ট নহেন।" তিনি বলেন, ঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর অল্পই হউক, আর বেশিই হউদ দরূদ শরীফ পাঠ করে, ফেরেশ্‌তাগণ তাহার জন্য মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে, সে আমার নিকট অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তাহার জন্য দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।" তিনি আরও বলেন, ঃ যে ব্যক্তি কিছু লিখিবার সময় আমার প্রতি দরূদ লিখে, যতদিন সেই লিখনে আমার নাম বিদ্যমান থাকে ততদিন ফেরেশ্‌তাগণ তাহার পাপ মোচনের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে।

ইস্তিগফার ঃ (ইস্তিগফার অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা) হযরত ইব্‌নে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন ঃ "কুরআন শরীফে দুইখানা আয়াত আছে, গুনাহ্‌গার লোক এই দুই আয়াত পাঠ করতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার গুনাহ্ মাফ করা হয়। দুইখানা আয়াত এই–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ "আর যাহারা কোন মন্দ কাজ করে অথবা তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচার করে, তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করিল। তৎপর নিজেকে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিল।"

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি পাপ কাজ করে অথবা নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করে, তৎপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী ও দয়াশীল পাইবে।" অন্যত্র আল্লাহ্ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ -

অর্থাৎ "অনন্তর আপনার প্রভুর প্রশংসা বর্ণনার সহিত তাঁহার তস্‌বীহ পাঠ করুন এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় বলিতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর; অবশ্যই তুমি তওবা কবূলকারী করুণাময়।" রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ " যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে সে যে কোন কষ্টেই হউক না কেন, আনন্দ লাভ করিবে এবং এমন স্থান হইতে জীবিকা পাইবে যাহার কল্পনাও সে করে নাই।" তিনি বলেন ঃ " আমি সমস্ত দিনে সত্তরবার তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন এরূপ তওবা ইস্তিগফার করিতেন তখন অপর লোকেরা তো কোন সময়েই তওবা ইস্তিগফার হইতে বিরত থাকা উচিত নহে। তিনি আরও বলেন ঃ" যে ব্যক্তি শয়নের সময়–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ -

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী।' তিনবার পড়ে তাহার গুনাহ্ সমুদ্রের কোন ফেনাপুঞ্জ, মরুভূমির বালুকারাশি, বৃক্ষের পত্ররাজি এবং পৃথিবীর দিনসমূহের ন্যায় অসংখ্য হইলেও ক্ষমা করা হইবে।" তিনি আরও বলেন ঃ "পাপ করামাত্র যথারীতি পাক পবিত্র হইয়া দুই রাকআত নামায পড়িলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সে পাপ ক্ষমা করা হয়।'

দু'আর আদব ঃ বিনয় ও বিলাপের সহিত দু'আ করিলে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়। রসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "দু'আ ইবাদতসমূহের মজ্জা ও সারাংশ।" কারণ, দাসত্বই ইবাদতের উদ্দেশ্য এবং বান্দা নিজের দীনতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করা এবং আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যেই দাসত্বের বিকাশ ঘটিয়া থাকে। দু'আর মধ্যে উভয় বিষয়ই নিহিত আছে। দু'আর মধ্যে বিনয় ও বিলাপ যত অধিক হয় ততই ভাল। দু'আ করিবার সময় আটটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। তাহা এই ঃ

প্রথম ঃ ফযীলতের সময় দু'আ করিবার চেষ্টা করা। আরাফার দিন, রমযান শরীফের মাস, জুম'আর দিন ,প্রাতঃকাল, রাত্রির। মধ্যভাগ ফযীলতের সময়। **দ্বিতীয়ঃ** ফযীলতের অবস্থার সময় দু'আ করা; যেমন ধর্মযোদ্ধাগণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইলে এবং ফরয নামাযের সময়। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এই সব সময়ে আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আযান ও

ইকামতের মধ্যবর্তীকালে , রোযা রাখা অবস্থায় এবং মন যখন খুব নরম থাকে, কেননা মন নরম হওয়া রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার লক্ষণ। তৃতীয় ঃ দুই হস্ত উঠাইয়া দু'আ করা এবং দু'আ শেষে উভয় হস্ত স্বীয় মুখের উপর স্থাপন করা। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,যে হস্ত আল্লাহ্‌র দরবারে তোলা হয় তাহা তিনি শুন্য অবস্থায় ফিরাইয়া দেন না। রাসূলে মাকবূল সাল্লল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি দু'আর জন্য হাত উঠায় সে তিনটি বিষয়ের কোন একটি হইতে বঞ্চিত হয় না-(ক) তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, (খ) সে সত্ত্বর কোন কিছু পাইবে অথবা (গ) তাহা ভবিষ্যতে পাইবে।" চতুর্থ ঃ দু'আ করিবার সময় ইহা কবুল ইহবে কিনা, এরূপ সন্দেহ মনে না আনা। বরং একাগ্র মনে বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, দু'আ অবশ্যই কবুল হইবে। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اُدْعُوا اللّٰهَ وَ اَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالاِجَابَةِ -

অর্থাৎ "দু'আ কবুল হইবে, এই ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে দু'আ কর।" পঞ্চম ঃ বিনয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দু'আ করা এবং দু'আর বাক্যগুলি বারবার বলা। কারণ, হাদীসে আছে যে, অন্যমনস্ক হৃদয়ের দু'আ কবূল হয় না। ষষ্ঠঃ বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সহিত বারবার প্রার্থনা করিতে থাকা, ইহাতেই লাগিয়া থাকা এবং বিরত না হওয়া। বহুবার দু'আ করিলাম তথাপি কবুল হইল না। এরূপ বলা উচিত নহে। কারণ, দু'আ কবুল হওয়ার কোন্‌টি উত্তম সময় এবং কবুলের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। দু'আ কবুল হইলে ইহা বলা সুন্নত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَةِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

অর্থা "সেই আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা যাঁহার নিয়ামতের সহিত সববিধ মঙ্গল পূর্ণ হয়।" দু'আ কবুলে দেরী হইলে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -

অর্থাৎ "সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা।" সপ্তম ঃ দু'আ করিবার পূর্বে তসবীহ ও দরূদ পাঠ করা। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আর পূর্বে বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلٰى الْوَهَّابِ -

অর্থাৎ " আমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, উচ্চপদে উচ্চ এবং অত্যন্ত দাতা।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ " যে ব্যক্তি

দু'আর পূর্বে দরূদ শরীফ পড়ে তাহার দু'আ কবুল হয়। আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু। দু'আর কিয়দংশ কবুল করিবেন এবং অংশ অগ্রাহ্য কিরবেন, এরূপ হয় না।" অর্থাৎ দরূদ সর্বদা কবুল হইয়া থাকে; সুতরাং দুরূদের সহিত অন্য দু'আরও অগ্রাহ্য হয় না। অষ্টম ঃ দু'আ করিবার পূর্বে তওবা করত পাপমুক্ত হওয়া এবং পাপ পথ পরিত্যাগ পূর্বক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করিয়া দেওয়া। কারণ, অন্যমনস্কতা ও পাপ-কালিমার দরুনই অধিকাংশ দু'আ কবুল হয় না।

হযরত কাবুল আহবার (রা) বলেন ঃ বনি ইসরাঈলের যমানায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম তাহার সমস্ত উম্মত লইয়া তিনবার বৃষ্টির জন্য দু'আ করিলেন। কিন্তু দু'আ কবুল হইল না। অবশেষে ওহী অসিল ঃ হে মূসা, তোমার দলের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে। সে তোমার দলের থাকাকালীন দু'আ কবুল হইবে না। হযরত মূসা আলায়হিসসালাম নিবেদন করিলেন ঃ "হে আল্লাহ কোন্ ব্যক্তি বলুন, বাহির করিয়া দিব।" ওহী আসিল ঃ "আমি চোগলখোরী করিতে নিষেধ করি। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে চোগলখোরী করিব? হযরত মূসা আলায়হিস সালাম সকলকেই চোগলখোরী হইতে তওবা করিতে বলিলেন ঃ সকলেই তওাবা করিল, তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইল।" হযরত মালিক ইবনে দীনার (রা) বলেন ঃ "একবার বনি ইসরাঈলের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বৃষ্টিবর্ষণের দু'আর জন্য মানুষ কয়েকবার মাঠে একত্রিত হইল। কিন্তু তাহাদের দু'আ কবুল হইল না। তাহাদের নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ "তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহারা অপবিত্র দেহে, হারাম খাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া এবং অত্যাচারের রক্তে রঞ্জিত হস্তে দু'আ করিতে আসিয়াছে। এই অবস্থায় (দু'আর জন্য) বহির্গত হওয়াতে তাহাদের উপর আমার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা আমার সম্মুখ হইতে দূর হউক।"

বিভিন্ন প্রকার দু'আ ঃ হাদীসে উক্ত যে সকল দু'আ রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন এবং যাহা সকাল ও সন্ধ্যায় এবং বিভিন্ন নামাযের পর বিভিন্ন সময় পড়া সুন্নত এরূপ দু'আ বহু আছে। এই সকলের অধিকাংশগুলিই 'ইয়াহুইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট দু'আ 'বিদায়াতুল হিদায়াহ্' কিতাবে সংগৃহীত হইয়াছে। আগ্রহশীল ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে শিখিয়া লইতে পারে। তৎসমুদয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলে কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। আবার তন্মধ্যে অনেক দু'আ মাশহুর এবং সকলেরই জানা আছে। কতিপয় দু'আ এমন আছে যাহা বিপদাপদে ও বিভিন্ন ব্যাপারে পাঠ করা সুন্নত অথচ অল্পলোকেই উহা অবগত আছে। এরূপ দু'আগুলি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। অর্থসহ শিখিয়া যথাসময়ে সূরাগুলি পড়া উচিত। কারণ, কোন সময়ই আল্লাহ্‌র যিকির হতে উদাসীন থাকা উচিত নহে এবং অন্তরকে দীনতা ও দু'আ শূন্য রাখা সঙ্গত নহে।

গৃহ হইতে বাহির সময় পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নামে ঘর হইতে বাহির হইতেছি। হে প্রভু, তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যেন আমি কাহাকেও পথভ্রষ্ট না করি, আমি যেন কাহারও উপর অত্যাচার না করি বা আমি যেন কাহারও কর্তৃক অত্যাচারিত না হই। আমি যেন কাহাকেও কষ্ট না দেই অথবা কাহারও দ্বারা কষ্টপ্রাপ্ত না হই। দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ ব্যতীত আমার মনোবল বা দৈহিক শক্তি কিছুই নাই। আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করিতেছি।"

মসজিদে প্রবেশের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। হে আল্লাহ্, আমার গুনাহ্ মাফ কর এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য উন্মুক্ত কর।" মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা অগ্রে রাখিবে।

মন্দ বাক্যালাপ হয় এমন মজলিসে বসিলে ইহার কাফ্‌ফারা -স্বরূপ পড়িবে।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوْءً وَّ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

অর্থাৎ " হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নাই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তওবা করিতেছি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি। আমি মন্দ কাজ করিয়াছি এবং আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত অপর কেহই পাপ ক্ষমা করিতে পারে না।

বাজারে যাওয়ার সময় পড়িবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক , তাঁহার কোন শরীক নাই। বিশ্বজগতের প্রভুত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও প্রাণ সংহার করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মারিবেন না। মঙ্গল তাঁহারই হস্তে এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।"

নুতন পোশাক পরিধানকালে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّمَا صُنِعَ لَهٗ -

অর্থাঃ "হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছ। অতএব তোমারই সকল প্রশংসা। এই পোশাকের মঙ্গল ও যত মঙ্গল ইহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং সৃষ্ট অমঙ্গল ও যত অমঙ্গল ইহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে তৎসমুদয় হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

নূতন চাঁদ দেখিবার সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَ رَبُّكَ اللّٰهُ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ ইহার উদয় আমাদের উপর এমন করুন যেন আমরা নিরাপদে ঈমান লইয়া শান্তির সহিত ইসলাম ধর্মে জীবন-যাপন করিতে পারি। (হে চন্দ্র) আল্লাহ্ আমার ও তোমার প্রভু।"

ঝড়-তুফানের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الرِّيْحِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَشَرِّ مَافِيهَا وَشَرِّمَا اَرْسَلْتَ بِهٖ -

অর্থাৎ " হে আল্লাহ, এই ঝড়ের মঙ্গল, যে মঙ্গল ইহার মধ্যে নিহিত আছে এবং যে মঙ্গল তুমি ইহার সঙ্গে করিয়াছ সে সমস্ত আমি তোমার নিকট চাহিতেছি। আর এই ঝড়ের অমঙ্গল ইহার মধ্যে আছে এবং যতক অমঙ্গল তুমি ইহার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছ, সে সমস্ত হইতে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

কাহার ও মৃত্যু সংবাদ শুনিলে পড়িবে ঃ

سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

অর্থাৎ " সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি; যিনি কখনও মরিবেন না। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্ আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব।"

দান করিবার সময় বলিবে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অর্থাৎ "হে প্রভু, আমাদের নিকট হইতে কবূল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।"

কোন ক্ষতি হইলে পড়িবে ঃ

عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ -

অর্থাৎ "অচিরেই আমাদের প্রভু এই ক্ষতির পরিবর্তে আমাদিগকে কোন মঙ্গল দান করিবেন। অবশ্যই আমাদের প্রভুর প্রতি আমরা অনুরাগী।"

নূতন কাজ আরম্ভ করিবার সময় বলিবে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا -

অর্থাৎ ঃ "হে প্রভু, আমাদিগকে তোমার খাস রহমত দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজের সঠিক আয়োজন করিয়া দাও।"

আস্‌মানের দিকে দৃষ্টি পড়িলে বলিবে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا -

অর্থাৎ "হে প্রভু, ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। অনন্তর আমাদিগকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই আল্লাহ্ মুবারক হউক যিনি আস্‌মানের কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে অতি উজ্জ্বল সূর্য ও প্রদীপ্ত চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

বজ্র-ধ্বনি শুনিলে বলিবে ঃ

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ -

অর্থাৎ " সেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি যাঁহার প্রশংসার সহিত রা'দ (নামক ফেরেশতা বা বজ্র-ধ্বনি) তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে এবং ফেরেশতাগণ যাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত রহিয়াছে।"

বিদ্যুত চমকাইলে বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার ক্রোধ দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিও না এবং তোমার আযাব দ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিও না। আর উহার পূর্বে আমাদিগকে নিরাপদে রাখ।"

বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ سُقْيًا هَنِيًا وَّصَبًّا نَافِعًا وَاجْعَلْهُ رَحْمَتِكَ وَّلَا تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابِكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ , এই বৃষ্টিকে তৃপ্তিদায়ক পানীয় ও হিতকর বষর্ণ রূপে পরিণত কর এবং ইহাকে তোমার উপকরণ বানাও ইহাকে তোমার আযাবের কারণস্বরূপ করিও না।"

ক্রোধের সময় পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَ اذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَ اَجِرْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আমার গুনাহ্ মাফ কর ও আমার অন্তরের ক্রোধ দূর কর এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে রক্ষা কর।"

কাহারও দ্বারা ক্ষতির আশংকা থাকিলে বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَ نَدْرَءُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তাহাদের অনিষ্ট হইতে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার সাহায্যে আমরা তাহাদের অনিষ্ট নিবারণ করিতেছি।"

শরীরের কোন স্থানে বেদনা হইলে ঃ

বেদনা-স্থলে হাত রাখিয়া তিনবার বলিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

এবং সাতবার বলিবে–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ -

অর্থাৎ "আমি যাহা কিছু অনুভব করিতেছি এবং আমি যাহা ভয় করিতেছি উহার অনিষ্ট হইতে আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার অসীম ক্ষমতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

দুঃখ-কষ্টে পতিত হইলে বলিবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

অর্থাৎ "উচ্চাদপি উচ্চ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, আকাশসমূহের অধিপতি ও গৌরবান্বিত আরশের অধিপতি ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই।

কোন কাজ সমাধা করিতে অক্ষম হইলে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ نَافِذٌ فِىَّ قَضَائُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِىْ كِتَابِكَ وَاَعْطَيْتَنَا اَحَدًا مَنْ خَلْقِكَ اَوِسْتَاثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ يَّجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ صَدْرِىْ وَ جِلَاءَ غَمِّىْ وَذِهَابَ حُزْنِىْ وَ هَمِّىْ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর সন্তান। আমার ললাট তোমার হাতে। তোমার নির্দেশ আমার উপর চালু তোমার বিধান আমার উপর প্রচলিত। আমি তোমার প্রতিটি নামের উসিলায়, যে নামে তুমি তোমার নামকরণ করিয়াছ ও যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করিয়াছ এবং যে নাম তুমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছ

অথবা তোমার নিকটে তোমার গায়েবী ইলমের মধ্যে যে নামকে তুমি প্রাধান্য দান করিয়াছ, প্রার্থনা করিতেছি যে, কুরআনকে আমার হৃদয়ের আনন্দ, আমার বক্ষের নূর, আমার চিন্তা মোচনকারী এবং আমার দুঃখ-কষ্ট বিদূরণকারী বানাও।"

আয়নাতে মুখ দেখিবার সময় বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقْتَنِىْ فَاَحْسَنَ خَلْقَنِىْ وَ صَوَّرَنِىْ فَاَحْسَنَ صُوْرَتِىْ -

অর্থাৎ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন ও আমার গঠন সুন্দর করিয়াছেন এবং আমাকে আকৃতিমান করিয়াছেন ও আমার আকৃতি সুশ্রী করিয়াছেন।"

গোলাম খরিদের সময় তাহার মাথার চুল ধরিয়া বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّمَا جُبِلَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, এই দাসের মঙ্গল ও ইহার প্রাপ্ত স্বভাবের মঙ্গল আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং এই দাসের অনিষ্ট হইতে এবং ইহার প্রাপ্ত স্বভাবের অনিষ্ট হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

শয়নের সময় বলিবে ঃ

رَبِّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَ بِاسْمِكَ اَرْفَعُهٗ هٰذِهٖ نَفْسِىْ اَنْتَ تَتَوَفَّهَالَكَ مَحْيَاهَا وَمَمَتَهَا اَنْ اَمْسَكْتَهَا فَاغْفِرْلَهَا وَ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ শয্যায় স্থাপন করিলাম এবং তোমার নামেই ইহা উঠাইবে। এই আমার জীবন, তুমিই ইহা সংহার করিবে। তোমারই জন্য জীবন ও মৃত্যু। তুমি যদি ইহাকে আবদ্ধ কর (অর্থাৎ প্রাণ সংহার কর) তবে ইহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ কর। আর যদি ইহাকে ফিরাইয়া দাও (অর্থাৎ নিদ্রা হইতে সজাগ কর) তবে তুমি যেরূপভাবে তোমার পুণ্যবান বান্দাগণের হিফাজত করিয়াছ তদ্রুপ ইহারও হিফাজত কর।"

জাগ্রত হইয়া বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ اَصْبَحْنَا وَاَسْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالسُّلْطَانُ وَالْعَظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لِلّٰهِ اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الاِخْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِيِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ "যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি মৃত্যুর পরে আমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাঁহারই সমীপে সমবেত হইব।আমরা ও সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্‌র জন্যই প্রভাতে উপনীত হইল। এক আল্লাহ্‌র জন্যই সকল প্রভুত্ব ও মহত্ত্ব ও সমস্ত মর্যাদা ও ক্ষমতা শুধু আল্লাহ্‌রই। আমরা প্রভাতে উপনীত হইলাম ইসলামী প্রকৃতি ও অকপট বাণীর উপর এবং আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধর্মের উপর ও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ধর্মের উপর যিনি সকল ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি অংশীবাদী ছিলেন না।"

দশম অধ্যায়

ওযীফার তরতীব

জীবন বাণিজ্যের মূলধন পরমায়ু ঃ দর্শন-খণ্ডে বর্ণিত বিষয় হইতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে বাণিজ্য উপলক্ষে জলস্থলময় জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আত্ম-উচ্চ জগতের পদার্থ-উচ্চ জগত হইতেই ইহা আসিয়াছে এবং তথায়ই ফিরিয়া যাইবে। এই বাণিজ্যের মূলধন একমাত্র তাহার পরমায়ু এবং মূলধন সর্বদা হ্রাস পাইতেছে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে লাভ করিতে না পারিলে মূলধন বৃথা অপচয় হইয়া যাইবে। এইজন্য আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية -

অর্থাৎ " আসরের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল লোক ক্ষতির মধ্যে নহে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও পরস্পরে সবরের পরামর্শ দান করিয়াছে।" মানবের পরমায়ুকে এমন ব্যক্তির অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যাহার মূলধন বরফ যাহা সে গ্রীষ্মের সময় বিক্রয় করে।সে লোকদিগকে ডাকিয়া বলে, "মুসলমান ভাইগণ, তোমরা এমন ব্যক্তির দয়া কর যাহার মূলধন গলনশীল, পলে পলে গলিয়া যাইতেছে।" মানুষের পরমায়ুরূপে মুলধন ও তদ্রুপ সর্বদা নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। পরমায়ু নিদিষ্ট কতকগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসমাত্র।

ইহার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই অবগত আছেন।

পরমায়ুর সদ্ব্যহার ঃ অনাগত ভীতি ও পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি শ্বাস -প্রশ্বাসকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে অনন্তকাল স্থায়ী সৌভাগ্য লাভের উপযোগী অমূল্য রত্ন বলিয়া মনে কের। বরং এরূপ ব্যক্তি স্বর্ণাদি মুলধন অপেক্ষা প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের অধিক যত্ন ও মমতা করিয়া থাকে। এই মমতার কারণে সেদিবারাত্রের সময়টুকু বিভিন্ন প্রকারের সৎকার্যের জন্য বিভক্ত করত প্রত্যেক কার্যের নিমিত্ত পৃথক পৃথক সময় নিদিষ্ট করিয়া লয় এবং যথারীতি নিধারিত

অযীফাসমূহ আদায় করিতে থাকে যেন তাহার এক মুহূর্তও বৃথা নষ্ট না হয়। কারণ সে জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত ও আকর্ষণ লইয়া ইহজগত পরিত্যাগ করিবে কেবল সে-ই পরকালের সৌভাগ্যের বীজ এবং যিকির ও ধ্যান-ধারণার জন্য অবসর লাভের উদ্দেশ্যই সংসার বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন ও পাপ পরিহার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

অবিরত যিকিরের পন্থা ঃ ইহার দুইটি পন্থা আছে।

প্রথম ঃ সর্বদা অন্তরে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলিতে থাকা, রসনা দ্বারা নহে। এমনকি অন্তর দ্বারাও বলিবে না। কারণ, অন্তর দ্বারা বলিলেও ইহা ইন্দ্রিয়ের কার্য বলিয়াই পরিগণিত। বরং এক মুহূর্তও অন্যমনস্ক না হইয়া অভ্যন্তরীণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্র ধ্যানে থাকা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া বড় দুস্কর এবং মনকে সর্বদা এক অবস্থায় নিবদ্ধ রাখিতে গিয়া অনেকেই হৃদয়ের স্বাভাবিক আনন্দ হারাইয়া ফেলে ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। এই জন্যই বিভিন্ন প্রকারের ওযীফা নিদিষ্ট করা হইয়াছে।

কতক কাজ সমস্ত শরীর দ্বারা করিতে হয়, যেমন সালাত। কতক কাজ কেবল রসনা দ্বারা সম্পন্ন হয়,যেমন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও তসবীহ তাহলীল পাঠ। আবার কতগুলি কাজ শুধু হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে, যেমন ধ্যান-ধারণা ও সৎ চিন্তা। এইরূপে বিভিন্ন ইবাদত করিলে মনে আনন্দ বিনষ্ট হয় না। কারণ, সময় বিভাগের শৃঙ্খলা অনুযায়ী নূতন কাজে লিপ্ত হইলে মন এক অবস্থা হইত অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করে। অপর দিকে দুনিয়ার জরুরী কার্যে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয় তাহাতেও পার্থক্য দেখা যায়।

দ্বিতীয় ঃ ফলকথা, সম্পূর্ণ সময় পরকালের কার্যে ব্যয় করিতে না পারিলে অধিকাংশ সময় কার্যে ব্যয় আবশ্যক যেন পরকালে নেকের পাল্লা ভারী হয়। অর্ধেক সময় দুনিয়ার কাজ ও অর্ধেক সময় পরকালের কাজে ব্যয় করিলে পাপের পাল্লা ভারী হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা। কারণ, প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজেই মন অধিক আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে ধর্ম-কার্যে মনসংযোগ করা প্রকৃতি বিরোধী এবং অকপটভাবে ধর্ম কর্ম করা বড় দুস্কর। যে ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হয় না তাহা নিস্ফল। সুতরাং ইবাদত অধিক পরিমাণে করা উচিত। তাহা হইলে কোন একটি ইখলাসের সহিত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হইতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ সময় ধর্ম-কার্যে লিপ্ত থাকা আবশ্যক এবং দুনিয়ার কাজ কর্ম ধর্ম কর্মের অধীনে রাখা উচিত। এজন্যই আল্লাহ্ বলেন-

وَمِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى -

অর্থাৎ "আর রাত্রির কিছু অংশে তসবীহ পাঠ করুন এবং দিবসের বিভিন্ন অংশেরও যেন আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন।" আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন–

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْلَهٗ وَ سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيْلاً -

অর্থাৎ "আর আপনার প্রভুর নাম সকাল ও সন্ধ্যায় স্মরণ করুন এবং রাত্রে তাঁহার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন ও দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপিয়া তাঁহার তসবীহ পাঠ করুন।" তিনি আরও বলেন–

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ -

অর্থাৎ "তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই শয়ন করে।" এই সকল আয়াত হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করা উচিত। সময়-বিভাগপূর্বক নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত যিকির না করিলে অধিকাংশ সময় যিকির অতিবাহিত করা যায় না। এজন্যই সময়-বিভাগের বর্ণনা জরুরী।

দিবাভাগের অযীফা ঃ দিবাভাগের অযীফা পাঁচটি। প্রথমটির সময় সুবহে সাদিক হইতে সুর্যোদয় পর্যন্ত। এই সময়ের বরকত ও শ্রেষ্ঠত্ব এত অধিক যে, আল্লাহ্ শপথের সহিত ইহার স্মরণ করত বলেন–

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ -

অর্থাৎ " প্রাতঃকালের শপথ যখন সে নিঃশ্বাস ফেলে।"

আবার বলেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি প্রভাতের প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।" তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَالِقُ الاِصْبَاحِ -

অর্থাৎ "উষা বিদীর্ণকারী।" এই সকল আয়াতে সুবহে সাদিক হইত সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এ সময়টুকু প্রতি মুহূর্ত অতি যত্নের সহিত আল্লাহ্র যিকিরে অতিবাহিত করা উচিত।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

এই দু'আ শেষ পর্যন্ত পড়িবে। (পূর্ণ দু'আ অর্থসহ নবম অধ্যায়ের শেষাংশে দ্রষ্টব্য)। তৎপর কাপড় পরিধানপূর্বক আলোচিত যিকির ও দু'আ পাঠে প্রবৃত্ত হইবে। বস্ত্র পরিধানকালে লজ্জাস্থান আবৃত ও আল্লাহ্র আদেশ পালনের নিয়ত করিবে। মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ও অপরের নিকট সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বস্ত্র পরিধান করিবে না। এইরূপ ইচ্ছাকে সভয়ে পরিত্যাগ করিবে। তৎপর পায়খানায় যাইবে। পায়খানায় যাইবার সময় প্রথমে বাম পা ভিতরে প্রবেশ করাইবে। পায়খানা হইতে বাহির হইয়া পূর্বে লিখিত দু'আ পাঠ ও যিকির করিতে মিসওয়াক ও ওযূ করিবে। তৎপর ফজরের সুন্নত নামায গৃহে পড়িয়া মসজিদে যাইবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরূপই করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দু'আ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সুন্নতের পরেই পড়িবে। 'বিদায়াতুল হিদায়া' কিতাবে এই দু'আ লিখিত আছে; মুখস্থ করিয়া লইবে। গৃহ হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে মসজিদে যাইবে এবং ডান পা মসজিদে স্থাপন করিতে করিতে মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়িবে। জামাআতে প্রথম সারিতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। সুন্নত নামায গৃহে পড়িয়া না থাকিলে এই সময় পড়িয়া লইবে। গৃহে সুন্নত নামায পড়িয়া থাকিলে দুই রাকআত 'তাহিয়াতুল মসজিদ' নামায পড়িবে এবং জামাআতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। এই সময় তস্বীহ ও ইস্তেগফার পাঠে লিপ্ত থাকিবে। জামা'আতে ফরয পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসিয়া যিকিরে মগ্ন থাকিবে। কারণ, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসিয়া থাকাকে আমি চারিটি গোলাম আযাদ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি।

ফজরের পর সুর্যোদয় পর্যন্ত কার্য ঃ এই সময়ে চারিটি কার্য, যথা ঃ (১) দু'আ (২) তসবীহ, (৩) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, (৪) আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকা।

ফজরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالاِكْرَامِ -

অর্থাৎঃ "হে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার পরিবারবর্গের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ্, তুমিই শান্তি, তোমা হইতেই শান্তি এবং শান্তি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিবে। প্রভু, শান্তির সহিত আমাদিগকে জীবিত রাখ এবং আমাদিগকে শান্তির আলোতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাও। হে প্রবল প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি, তুমি অতীব মঙ্গলময়।' তৎপর এই সময়ে পড়িবার জন্য হাদীসে যে সকল দু'আ আছে উহা পড়িতে থাকিবে। দু'আসমূহ কিতাব দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইবে।

দু'আ পড়িয়া তসবীহ-তাহলীল পড়িতে থাকিবে। প্রত্যেকটি একশত বার, সত্তর বার কিংবা অন্ততপক্ষে দশবার পড়িবে। দশটি যিকির দশবার করিয়া পড়িলে মোট একশত বার হয়। ইহার কম করা উচিত নহে। নিম্নলিখিত দশটি যিকিরের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস আছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সেগুলি উদ্ধৃত করা হইল না।

প্রথম যিকির ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر -

(নবম অধ্যায়ে শেষাংশে দ্রষ্টব্য।)

দ্বিতীয় যিকির ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ -

অর্থাৎ " আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনার উপযোগী অপর কেহই নাই। তিনি সত্য ও সুস্পষ্ট প্রভু।"

তৃতীয় যিকির

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

অর্থাৎ " আমি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মানবিক শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতা নাই।"

চতুর্থ যিকির ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

পঞ্চম যিকির ঃ

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

অর্থাৎ "তিনি পবিত্র বিশুদ্ধ। তিনি আমাদের প্রভু এবং সকর ফেরেশতা ও জিবরাঈল (আ)-এর প্রভু।

ষষ্ঠ যিকির ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ -

অর্থাৎ "সেই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তারই নিকট তওবার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি।"

সপ্তম যিকির ঃ

يَا حَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ -

অর্থাৎ "হে চিরস্থায়ী,তোমার রহমত দ্বারা সাহায্য ফরিয়াদ করিতেছি, এক পলকের জন্যও আমাকে প্রবৃত্তির নিকট ছাড়িয়া দিও না এবং আমার যাবতীয় কর্ম সংশোধন করিয়া দাও।"

অষ্টম যিকির ঃ

اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ তুমি যাহা দান কর,তাহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই, আর যাহা তুমি বারণ কর তাহা প্রদানকারী কেহই নাই। তোমা ব্যতীত কেহই সম্পদশালীর উপকার করিতে পারে না। তোমা হইতে সম্পদ আগমন করে।"

নবম যিকির ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ -

অর্থাৎ " হে আল্লাহ্, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ, সন্তানসন্ততির উপর রহমত বর্ষণ কর।"

দশম যিকির ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অর্থাৎ " আমি সেই আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি যাহার নামের সহিত কোন পদার্থই কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না ভূতলেও না এবং আসমানেও না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।"

উল্লিখিত দশ যিকিরের প্রত্যেকটি দশবার করিয়া পড়িবে কিংবা যতবার করিয়া পার পড়িবে। প্রত্যেকটির ফযীলত পৃথক পৃথক এবং মাধুর্যও ভিন্ন ভিন্ন।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ঃ ইহার পর কুরআন শরীফ পাঠে লিপ্ত হইবে। কুরআন শরীফ পাঠে অক্ষম হইলে এই নির্বাচিত অংশগুলি মুখস্থ করিয়া লইবে এবং রীতিমত পাঠ করিবে-'আয়তুল কুরসী', 'আমানার রাসূল' হইতে আরম্ভ করিয়া সূরা বাকারার শেষ পর্যন্ত, সূরা আলে-ইমরানের 'শাহিদাল্লাহু' হইতে আরম্ভ করত 'ওয়াল্লাহ বাসীরুম বিল্ ইবাদ' পর্যন্ত আলে-ইমরানের 'কুলিল্লাহুমা মালিকাল মুলকি' হইতে আরম্ভ করত 'ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পর্যন্ত হাদীসের প্রথম অংশ এবং সূরা হাশরের শেষ অংশ। যিকির, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত দু'আ এই তিন বস্তুর সমাবেশ একত্রে পাইতে ইচ্ছা করিলে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম হযরত ইবরাহীম তাইমী (র)-কে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিবে। উহার ফযীলত অপরিসীম; ইহাকে মুসাব্বাআ'তে আশারা বলে। উহাতে দশটি বস্তু আছে, প্রত্যেকটি সাতবার করিয়া পড়িতে হয়। উহা এই-(১) সূরা ফাতিহা, (২) সূরা ফালাক,(৩) সূরা নাস, (৪) সূরা ইখলাস, (৫) সূরা কাফিরুন, (৬) আয়াতুল কুরসী। কুরআন শরীফের এই ছয় বস্তু। অবশিষ্ট চারিটি যিকির জাতীয় যথা ঃ

(৭) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(৮) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ

(৯) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ সমস্ত মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা কর।"

(১০)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَافْعَلْ لِىْ وَ بِهِمْ عَاجِلاً وَّاٰجِلاً فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلاَنَا مَا نَحْنُ لَهٗ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে ক্ষমা কর এবং তুমি শীঘ্র ও বিলম্বে, দুনিয়াতে ও আখিরাতে আমার ও তাহাদের প্রতি এমন ব্যবহার কর যাহার তুমি উপযুক্ত। আমরা যাহার উপযুক্ত এমন আচরণ আমাদের প্রতি করিও না। অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল দয়ালু।" এই মুসাব্বাআতে আশারার ফযীলত সম্বন্ধে 'ইয়াহইয়াউল উলূম" গ্রন্থে একটি বড় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ঃ

আল্লাহ্র ধ্যান ও সৎচিন্তা ঃ উল্লিখিত যিকির ও দু'আ সমাধা করত আল্লাহ্র ধ্যান ও সৎচিন্তায় (তাফাক্কুরে) লিপ্ত হও। ইহা বিভিন্ন প্রণালীতে করা চলে। এই গ্রন্থের শেষ ভাগে পরিত্রাণ খণ্ডে উহার আলোচনা হইবে। কিন্তু প্রত্যহ যেরূপ ধ্যান করা আবশ্যক তাহা এই—চিন্তা করিবে যে, আমরা মৃত্যু ও পরকালের দিকে অগ্রসর হইতেছি এবং মনে মনে বলিবে যে, হয়ত মৃত্যু ঘটিতে একদিনের অধিক বিলম্ব নাই। এরূপ চিন্তার উপকারিতা অত্যধিক। কারণ, দীর্ঘ জীবনের আশা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় বলিয়াই মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট থাকে। যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, এক মাস বা এক বৎসরের মধ্যে অবশ্যই মরিতে হইবে সে নিশ্চয়ই পার্থিব সমস্ত কাজকর্ম বর্জন করিবে। অথচ একদিনের মধ্যে মরিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তথাপি মানুষ এমন এমন কাজে হাত দেয় যাহা দশ বৎসরে সামাধা হয় না। এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ وَاَنْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ -

অর্থাৎ "তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে না এবং সে সকল বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন? আর (এ বিষয়ের প্রতি) লক্ষ্য

করিতেছে না যে, সম্ভবত তাহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে?" অন্তর নির্মল করত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে পরলোকের সম্বল সংগ্রহের স্পৃহা অবশ্যই মনে প্রবল হইয়া উঠে।

অধিকন্তু এইরূপ চিন্তা করা উচিত–অদ্যকার দিনে কি পরিমাণ সওয়াব লাভ করা যাইতে পারে? কোন্ কোন্ গুনাহ্ হইতে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে? গত জীবনে কি কি গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে যাহার ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক? এই সব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। তাঁহাদের অন্তরচক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছে তাঁহারা আসমান ও পৃথিবীর রাজ্যসমূহ এবং উহাদের বিস্ময়কর বিষয়গুলির প্রতি অনুধাবন করিবেন। এমনকি সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য দর্শন করিবেন। শেষোক্ত ধ্যান ও চিন্তা সর্ববিধ ইবাদত ও চিন্তা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, ইহা হইতেই আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠে এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে তৎপ্রতি মহব্বত প্রবল হইয়া উঠে না; আর চরম মহব্বতের বিনিময়ে পরম সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সকলের অন্তরচক্ষু উন্মুক্ত হয় না। এমতাবস্থায় যে-সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ্ আমাদিগকে দান করিয়াছেন তৎসমুদয় স্মরণ করিবে এবং মানুষ দুনিয়াতে যে সকল পীড়া, দারিদ্র ইত্যাদি নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত রহিয়াছে উহা হইতে আল্লাহ্ যে তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমার কর্তব্য। আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চলিলে এবং পাপ হইতে বিরত থাকিলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল।

মোটকথা, প্রাতঃকালে এইরূপ ধ্যান ও চিন্তায় কাটাইবে। কারণ, সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ফজরের সুন্নত এবং ফরয ব্যতীত অন্য নামায জায়েয নহে। সুতরাং এই সময়ে নফল নামাযের পরিবর্তে যিকির ধ্যানে মগ্ন থাকিবে।

দিবসের দ্বিতীয় ভাগ ঃ সূর্যোদয় হইতে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত সময় এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভব হইলে সূর্য এক বল্লম উর্দ্ধে না উঠা পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করিবে এবং তসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকিবে। সূর্য এক বল্লম উপরে উঠিলে দুই রাকআত নফল নামায পড়িবে। তৎপর সূর্য আরও উপরে উঠিলে চাশতের নামায পড়া উত্তম। এই নামায চার, ছয় বা আট রাকআত পড়িবে। এই সবগুলিই কিতাবে বর্ণিত আছে। অথবা সূর্য এক বল্লম উপরে উঠিলে দুই রাকআত নামায পড়িয়া মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নেক কার্যসমূহে লিপ্ত হইবে; যেমন, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার পশ্চাতে পশ্চাতে কবরস্তানে গমন করা, মুসলমানদের উপকার করা, আলিমগণের দীনি মজলিসে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি।

দিবসের তৃতীয় ভাগ ঃ চাশতের সময় হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। লোকের অবস্থাভেদে এই সময়টুকু ব্যয়ের বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা আছে। তবে নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীর বহির্ভূত কেহই হইতে পারে না।

প্রথম ঃ ইল্ম শিক্ষা করিতে যে ব্যক্তি সক্ষম তাহার জন্য এই সময়ে ইল্ম শিক্ষা করা অপেক্ষা অন্য কোন ইবাদতই উৎকৃষ্ট নহে। এমনকি বিদ্যা শিক্ষার্থীকে ফজরের নামায পড়িয়াই বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, একমাত্র পরকালের পক্ষে মঙ্গলজনক বিদ্যাই উৎকৃষ্ট। যে বিদ্যা দুনিয়ার আসক্তি শিথিল করত পরকালের আসক্তি প্রবল করিয়া তোলে এবং ইবাদত-কার্যে যে সকল দোষত্রুটি সংঘটিত হয় তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া আন্তরিকতার সহিত একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই পরকালের পক্ষে মঙ্গলজনক বিদ্যা। কিন্তু তর্কশাস্ত্র যাহা পরস্পর ঝগড়া-বিরোধ ও ক্রোধ শিক্ষা দেয় এবং ইতিবৃত্ত ও কিচ্ছা-কাহিনী যাহা রচনা চাতুর্য ও অলঙ্কারাদি ভাষায় পরিপূর্ণ, তৎসমুদয় দুনিয়ার লোভ অধিকতর বৃদ্ধি করে এবং গর্ব ও হিংসার বীজ অন্তরে বপন করে। হিতকর বিদ্যা 'ইয়াহইয়াউল উলুম', 'জাওয়াহেরুল কুরআন' এবং এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সকল বিদ্যার পূর্বে এই বিদ্যা অর্জন করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় ঃ যাঁহারা বিদ্যা অর্জনে অক্ষম, কিন্তু যিকির তাসবীহ ও ইবাদত কার্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন। এই প্রকার লোক আবেদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মর্যাদা অতি উচ্চ। বিশেষত তাঁহারা যদি এমন যিকিরে লিপ্ত থাকিতে পারেন যাহার প্রভাব অন্তরে প্রাধান্য লাভ করে এবং অন্তরে স্থান লাভপূর্বক স্থায়ী হইয়া পড়ে তবে তাঁহাদের মর্যাদা আরও উর্ধ্বে।

তৃতীয় ঃ যাহা অপর লোকের সুখবর্ধক ও আরামদায়ক কার্যে লিপ্ত। সূফী দরবেশ আলিম ও অভাবগ্রস্তদের সেবা করা এই শ্রেণীর কার্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা নফল নামায অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইহা স্বয়ং ইবাদত এবং ইহাতে মুসলমানদের সুখ লাভ করে ও ঐ সকল ব্যক্তির ইবাদতের কার্যে সহায়তা করা হয়। এই শ্রেণীর লোকের দু'আ অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে।

চতুর্থ ঃ যাহারা উপরোক্ত তিন প্রকার কার্যে অক্ষম এবং নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা অর্জনে লিপ্ত, তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর লোক যদি আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তাহাদের হস্ত ও রসনা দ্বারা অপর লোকের কোন অনিষ্ট না করে, দুনিয়ার লোভ অতিরিক্ত উপার্জনে তাহাদিগকে লিপ্ত না করে এবং নিজেদের অভাব মোচন উপযোগী জীবিকায় হৃষ্টচিত্তে তৃপ্ত থাকিতে পারে, তবে

তাহারা পূর্ববর্তী আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের সমপর্যায়ভুক্ত না হইলেও সাধারণ শ্রেণীর আবেদগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কিয়ামত দিবস যাহাদের আমলনামা তাহাদের ডান হস্তে প্রদান করা হইবে তাহারা তাদের দলভুক্ত হইবে।

যাহারা ডান হস্তে আমলনামা পাইয়া মুক্তিলাভ করিবে অন্তত তাহাদের দলভুক্ত হওয়া আবশ্য কর্তব্য। ইহাই সর্বনিম্ন শ্রেণী। যে ব্যক্তি উল্লিখিত চারি প্রকারের কোন এক শ্রেণীর লোকের ন্যায় সময় ব্যয় না করিবে সে অবশ্যই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত ও শয়তানের অনুসরণকারী গোলাম বলিয়া গণ্য হইবে।

দিবসের চতুর্থ ভাগ ঃ দ্বিপ্রহরের অব্যবহিত পর হইতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত। জোহরের সময় হওয়ার পূর্বে শয়ন করত সামান্য বিশ্রাম করিয়া লওয়া উচিত। কারণ রাত্রিকালে ইবাদতের জন্য ইহা রোযার জন্য সেহরীতুল্য। রাত্রে ইবাদত না করিলে দ্বিপ্রহরে নিদ্রা মাকরূহ। কেননা অতিরিক্ত নিদ্রা মাকরূহ। দ্বিপ্রহরের সামান্য নিদ্রার পর জোহরের সময়ের পূর্বে প্রয়োজনীয় ওযূ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিবে এবং আযানের পূর্বে মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করিবে। মসজিদে পৌছিয়া 'দুখলুল মসজিদ' নামায পড়িবে। মুয়াযযিন আযান আরম্ভ করিলে ইহার জওয়াব দিবে। ফরযের পূর্বে চারি রাকাআত নামায অধিক সময় লাগাইয়া পড়িবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই চারি রাকআত অধিক লম্বা করিয়া পড়িতেন এবং বলিতেন যে, এই সময় আসমানের দরজা উন্মুক্ত থাকে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই চারি রাকআত নামায পড়ে, সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার সহিত নামায পড়িতে থাকে এবং রাত্রি পর্যন্ত সেই নামাযীর মুক্তির জন্য দু'আ করিতে থাকে। তৎপর জামা'আতের সহিত ফরয নামায পড়িবে এবং ইহার পর দুই রাকআত সুন্নত পড়িবে। অতঃপর আসরের পূর্বে পর্যন্ত ইল্‌ম শিক্ষা দানে, মুসলমানদের সাহায্যের কার্যে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে অথবা জরুরী অভাব মোচনের জন্য হালাল জীবিকা অর্জনে মনোনিবেশ করিবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সাংসারিক কার্যে লিপ্ত হইবে না।

দিবসের পঞ্চম ভাগ ঃ আসরের সময় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আসরের সময় হওয়া মাত্র মসজিদে যাইয়া চারি রাকআত সুন্নত নামায পড়িবে। কারণ, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আসরের ফরযের পূর্বে যে ব্যক্তি চারি রাকআত নামায পড়ে তাহার উপর আল্লাহ্‌ রহমত নাযিল করেন।' আসরের ফরয পড়ার পর পূর্ব বর্ণিত কাজগুলি ব্যতীত অন্য কোন সাংসারিক কাজে লিপ্ত হইবে না। তৎপর মাগরিবের নামাযের পূর্বে মসজিদে যাইবে এবং তসবীহ ও ইস্তেগফার পাঠে মগ্ন থাকিবে। কেননা, এই সময়ের ফযীলত সুবহে সাদিকের সময়ের ফযীলতের সমতুল্য। কারণ. আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا -

অর্থাৎ "সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসার সহিত তসবীহ পাঠ করো। এসময়ে সূরা ওয়াশ-শাম্‌স, সূরা ওয়াল-লাইল, সূরা ফালাক ও সূরা নাস' পাঠ করা উচিত। সূর্যাস্তের সময়ে ইস্তেগফার পাঠে রত থাকা আবশ্যক।

ফলকথা, যাহার জীবনে প্রত্যেকটি দিবস যথোপযুক্তরূপে বিভক্ত হইয়া প্রতিটি অংশ যথানিয়মে সময়োপযোগী নেক কার্যে ব্যয়িত হয় তাহার জীবনের সদ্ব্যবহার হয় এবং জীবন মঙ্গলময় হইয়া উঠে। অপরপক্ষে যাহার সময়-শৃঙ্খলা নাই এবং ঘটনাচক্রে যাহা হয় তাহাই করিতে থাকে, তাহার জীবনের বহু সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

রাত্রিকাল তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথম ভাগ ঃ মাগরিব হইতে ইশার নামায পর্যন্ত। এই সময় জাগ্রত থাকার ফযীলত অনেক। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, এই সময়ের ফযীলত সম্বন্ধেই আল্লাহ বলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

অর্থাৎ "তাহাদের পার্শ্বসমূহ বিছানা হইতে দূরে থাকে।" মাগরিব হইতে ইশার নামায পর্যন্ত নামাযেই লিপ্ত থাকা উচিত। বুযর্গগণ এই সময়টুকু ইবাদতে অতিবাহিত করাকে রোযা রাখা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা এই সময়ে পানাহার করেন না। বিতরের নামাযের পর বৃথা গল্পগুজব ও খেল-তামাশায় লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, দিবসের কাজ এখানেই সমাপ্ত হয় এবং উত্তম কার্যের সহিত ইহার পরিসমাপ্তি করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ইহা নিদ্রার সময়। সকলের নিদ্রা ইবাদতে গণ্য হয় না। যথানিয়মে সুন্নত অনুযায়ী শয়ন করিলে নিদ্রাও ইবাদতে পরিণত হয়।

সুন্নত অনুযায়ী শয়নের নিয়ম ঃ মৃত ব্যক্তিকে যেভাবে কবরে স্থাপন করা হয়, তদ্রূপ কিবলামুখী হইয়া প্রথমে ডান পার্শ্ব বিছানায় স্থাপন করিবে। নিদ্রাকে আবার ফিরিয়া নাও পাইতে পার। সুতরাং নিদ্রার পূর্বে পরকালের কার্যাবলী ঠিক করিয়াই শয্যা গ্রহণ করা উচিত। ওযূ প্রভৃতি দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করত অতীত পাপের জন্য তওবা করিয়া শয়ন করিবে এবং দৃঢ় সংকল্প করিবে যে, জাগ্রত হইলে আর কখনও পাপ করিবে না। তোমার অন্তিম নির্দেশনামা বালিশের নিচে রাখিবে। আরামের

অভিপ্রায়ে বেহুদা নিদ্রাকে ডাকিয়া আনিবে না। কোমল শয্যায় শয়ন করিবে না। কারণ, কোমল শয্যায় দীর্ঘ নিদ্রা হইয়া থাকে এবং নিদ্রায় পরমায়ু বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আট ঘন্টার অধিক নিদ্রায় কাটাইয়া দেওয়া উচিত নহে। আট ঘন্টা ঘুমাইলে জীবনের এক তৃতীয়াংশ নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। সুতরাং যাহার পরমায়ু ষাট বৎসর তাহার বিশ বৎসর নিদ্রায় অপচয় হয়। ইহার অধিক অপচয় করা উচিত নহে। পানি ও মিসওয়াক নিজ হস্তে রাখিয়া দিবে যেন শেষরাত্রে নামাযের জন্য উঠিয়া কোন অসুবিধা না হয়। নিদ্রা যাইবার সময় শেষরাত্রে অথবা অতি প্রত্যুষে নামাযের জন্য উঠিবার নিয়ম করিবে। এইরূপ নিয়ত করত শয়ন করিলে প্রগাঢ় নিদ্রার আবেগে দীর্ঘকাল ঘুমাইলেও নিয়তের কারণে কিছু সওয়াব মিলিবে। শয়নকালে বলিবে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَ بِاسْمِكَ اَرْفَعُهُ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ তোমার নামেই আমার পার্শ্ব শয্যায় স্থাপন করিলাম এবং তোমার নামেই ইহা শয্যা হইতে উঠাইব।" মোটকথা শয়নকালে এই দু'আ এবং পূর্ববর্ণিত দু'আসমূহ পড়িবে। ইহা ব্যতীত আয়াতুল কুরসী, আমানার-রাসূল, সূরা ফালাক , সূরা নাস ও সূরা মূলক পড়িবে। অভ্যাস এইরূপ করিয়া লইবে যেন ওযূর সহিত পড়িতে পড়িতে নিদ্রা আসিয়া পড়ে। এইরূপ শয়ন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মাকে আরশে লইয়া যাওয়া হয় এবং জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত নামাযের রত বলিয়া গণ্য করা হয়।

তৃতীয় ভাগ ঃ তাহাজ্জুদের সময়। তাহাজ্জুদ গভীর রাত্রের নামায অপেক্ষা ভাল। কারণ, তখন অন্তর নির্মল থাকে, দুনিয়ার কোন কর্মব্যস্ততা থাকে না এবং আল্লাহ্র রহমতের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্বন্ধে বহু হাদীস আছে। 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' কিতাবে এই সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ফলকথা, দিবারাত্রির ভিন্ন ভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক কার্য নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া কর্তব্য এবং এক মূহূর্তও বেহুদা অপচয় করা উচিত নহে। দিবা-রাত্রির বিভিন্ন অংশ কোন একদিন উক্ত নিয়মে কাটাইয়া থাকিলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি দিন আশা পোষণ করিবে না। মনে মনে বলিবে, আজ দিবাভাগের তো এইরূপ কাজ করিয়া লই হয়ত আজ রাত্রেই মরিয়া যাইব। আবার রজনী আগমনে বলিবে অদ্য রাত্রে উক্ত নিয়মে কাজ করিয়া তওবা করিয়া লই। সম্ভবত কালই আমার মৃত্যু ঘটিবে। প্রত্যহ নিজের মনকে এইরূপে প্রবোধ দিতে থাকিবে। সর্বদা এইরূপ করিতে

থাকিলে অবশেষে তুমি অবশ্যই উক্ত কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং অনায়াসে কার্য চলিতে আবাসভূমি বলিয়া দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া লইবে। সফরে প্রবাসের কষ্ট থাকেই। কিন্তু প্রবাসভূমি শীঘ্র পরিত্যাগপূর্বক সুখের আলয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই সকল কষ্টের অবসান ঘটে। পরকালের অনন্ত অসীম জীবনের তুলনায় ইহকালের সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী জীবন কিছুই নহে। দশ বৎসরের সুখ লাভের আশায় কেহ যদি এক বৎসরের কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করিয়া লয়, তবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? এমতাবস্থায় একশত বৎসরের ইহলৌকিক জীবনে একটু কষ্ট ভোগ করত পরলোকে লক্ষ লক্ষ বৎসরের নহে বরং অনন্তকালের জন্য অশেষ সুখের অধিকারী হওয়াতে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে?

ইফাবা-২০০৩-২০০৪-প্র/৫৬৫১ (উ)-৭,২৫০